নীললোহিতের চেনা অচেনা

প্রভাতী ও দিলীপ দত্তকে

১

মাত্র দুটাকায় একটা কস্তুরী কিনে ফেললাম। কোন-কোন হরিণের পেটে যে জিনিস হয়, তীব্র যার গন্ধ, যে গন্ধের তাড়নায় হরিণ পাগলের মতো বনে-বনে ছুটে বেড়ায়।

জিনিসটা শক্ত, ছোটখাটো মুরগির ডিমের মতন সাইজ, হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া, নাকের কাছে আনলে বেশ মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। জিনিসটা পেয়ে আমার বেশ আনন্দ হলো।

কস্তুরীর জন্য আমার যে খুব আগ্রহ ছিল কিংবা কস্তুরী কেনার জন্য ব্যগ্রভাবে খোঁজাখুঁজি করছিলাম, তা অবশ্য নয়। একটা থুত্থুরে বুড়ি জোর করে গছিয়ে দিয়ে গেল।

দুপুরবেলা, বাড়িতে আমি একা, দরজায় কড়া নাড়া। দরজা খুলে দেখি নোংরা, ধুলোয় ভরতি ঘাগরা ধরনের পোশাক-পরা এক বুড়ি। বুঝলাম ভিক্ষে চাইতে এসেছে। দরজার কড়া নেড়ে কিংবা কলিং বেল টিপে ভিক্ষে চাওয়ার ফ্যাশানটা চালু হয়েছে অল্পকিছুদিন ধরে। বুড়ি কিছু বলার আগেই আমি বিরক্তভাবে বললাম, এখন কিছু হবে না, হবে না, যাও।

বুড়ি দরজার কাছে বসে পড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, আমি বুঝতেই পারলাম না। ওকে দেখে কোন পাহাড়ি জাত মনে হয়। ঝুলির ভেতর থেকে কতকগুলো জন্তু-জানোয়ারের হাড়, শিং, দাঁত বার করে ভাঙা হিন্দি-বাংলা মেশানো ভাষায় জিজ্ঞেস করল, বাবু, এগুলো কিনবে?

আমি তো আর তন্ত্রসাধনা করি না যে ওসব জিনিস আমার কাজে লাগবে। বললাম, কিছু চাই না। তুমি যাও—অন্য জায়গায় দেখো।

—মাইজী বাড়িতে নেই?

বুঝলাম, আমার কাছে সুবিধে হবে না বলে বাড়ির মেয়েদের ডাকতে চায়। চুরি টুরির মতলবে আছে কিনা কে জানে! একটু রুক্ষভাবে বললাম, মাইজি টাইজি কেউ নেই। যাও হিঁয়াসে, দরজা বন্ধ করেগা—

বুড়ি এবার বলল, বাবু একটু জল খাওয়াবে? বড্ড তিয়াস লেগেছে। মাথা ঘুরছে আমার—!

যতই বিরক্ত হই, কেউ জল চাইলে না বলা যায় না। একথাও বলা যায়না

যে, রাস্তায় কল আছে সেখান থেকে খেয়ে নাও! আমি নিজেও কত অচেনা জায়গায় অচেনা বাড়িতে জল খেতে চেয়েছি। ভিক্ষে দেবার ব্যাপারে কঠোর হতে পারি, কিন্তু তৃষ্ণার্তকে জল দিতেই হয়। বুড়ি যাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে না-পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রেখে আমি ওকে জল এনে দিলাম।

ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে বুড়ি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাবু, তুমি এসব কিছু কিনবে না?

—না!

বুড়ি তখন তার ঝুলি থেকে সেই গোল চামড়া-মোড়া পদার্থটা বার করে বলল, এই নাও, কস্তুরী! এ তুমি বাজার ঢুঁড়লেও পাবে না।

কস্তুরীর কথা শুধু কবিতাতেই পড়েছি। আগে কখনো চোখে দেখিনি জিনিসটা। এমনকী সত্যি-সত্যি কস্তুরী বলে কিছু হয় কিনা—সাপের মাথার মণির মতনই অলীক রূপকথা কিনা তাও জানি না।

তবু একটু কৌতূহল হলোই। হাতে নিয়ে দেখলাম জিনিসটা। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কস্তুরী? যাঃ!

—হ্যাঁ, বাবু, তুমি গন্ধ শুঁকে দেখো!—

নাকের কাছে এনে একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম ঠিকই। তবু সন্দেহ গেল না।

—তুমি কোথায় পেলে এ জিনিস?

—নেপালের জঙ্গল থেকে। এ চিজ হরবখত নেহি মিলতা। কভি-কভি দোঠো-একঠো মিল যায়। এটা তোমার ঘরে রেখে দিলে সবসময় ঘরে সুন্দর গন্ধ হয়ে থাকবে।

আমার ঘর সবসময় সুগন্ধে আমোদিত করে রাখার কোন দরকার নেই। তবু কস্তুরী শব্দটাই এমন রোমান্টিক যে খানিকটা আসক্তি হয়ই।

জিজ্ঞেস করলাম, কত দাম?

—পঞ্চাশ টাকা। সস্তামে ছোড় দেতা হ্যায়।

পঞ্চাশ কেন, পাচশো টাকা বললেও আমি অবাক হতাম না। কস্তুরী জিনিসটা দুর্লভ নিশ্চয়ই, আর তো কারুর কাছে দেখিনি। তবে, এরকম একটা দুর্লভ জিনিস নিউ মার্কেট ফার্কেটে না-নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা আমার কাছেই-বা এসেছে কেন, এই ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগল।

বুড়ি আমার মুখভঙ্গি লক্ষ করে বলল, বাবু, দেখবে কস্তুরী কীরকম? তোমার হাতটা নিয়ে এসো আমার সামনে—। এই যে, হাতের মধ্যে এটা এরকমভাবে মুঠো করে ধরো। আচ্ছা, ওটাকে এবার রেখে দাও, এখন হাতের গন্ধ শুঁকে দ্যাখো, দুদিকেই গন্ধ।

আমি এ ব্যাপারটায় সত্যিই হতবাক হয়ে পড়লাম। কোন একটা জিনিস হাতে মুঠো করে ধরলে, হাতে গন্ধ হয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু হাতের উলটো পিঠেও আমি সেই গন্ধ পাচ্ছি। কস্তুরীর সুবাস আমার রক্ত-মাংস-হাড় ভেদ করে আসছে। জিনিসটা সত্যিই অভূতপূর্ব।

সে যাই হোক, পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। আমতা-আমতা করে বললাম, ইতনা ছোটা চিজকা দাম পঞ্চাশ রুপিয়া?

—ঠিক হ্যায়, আপ বিশ রুপিয়া দিজিয়ে!

এক ঝটকায় একেবারে তিরিশ টাকা কমে গেল, আমি একটু সতর্ক হয়ে উঠলাম! আবার বললাম, বিশ রুপিয়া?

—ঠিক হ্যায়, দশঠো রুপিয়া দে দিজিয়ে!

আমি অবাক। কস্তুরী সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ না-থাকতে পারে, কিন্তু এরকম একটা খ্যাতিসম্পন্ন জিনিসের দাম দশ টাকার বেশি নিশ্চয়ই! এই বুড়ি কি দরদাম জানে না? তা হতেই পারে না, মেয়েরা কোন জিনিস কিনতে বা বিক্রি করতে গিয়ে ঠকবে—এ ব্যাপার পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি। তাহলে কী ও আমাকে এতই পছন্দ করে ফেলেছে যে, দামের পরোয়া না-করে ও ওই মূল্যবান জিনিসটা আমাকেই দিতে চায়!

আমি চুপ করে আছি বলে বুড়ি বলল, দশ টাকাও দেবে না? ঠিক আছে পাচ টাকা অন্তত দাও। তাও দেবে না, আচ্ছা আর আপত্তি কোবো না—দুটো টাকা দিয়ে দাও বাবু! এরকম বড়িয়া চীজ—

আমার তখন রীতিমতন ভয় করতে লাগল। পঞ্চাশ টাকা থেকে দুটাকায় নেমে আসা—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হচ্ছে! শেষটায় না আমাকে বিনাপয়সাতেই দিয়ে দেয়! অন্তত, চারআনা-আটআনায় যদি নেমে আসে, সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুবই অপমানজনক হবে। তাড়াতাড়ি আমি দুটো টাকা ওর হাতে তুলে দিলাম। মনে একটু খচখচ করতে লাগল, কস্তুরীর মতন একটা জিনিসের বিনিময়ে আমার আরো কিছু বেশি দামই-দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কী করব, দুটাকার বেশি যে ছিল না! বাজার করার পয়সা মেরে আর কত রোজগার দেওয়া যায়!

বুড়ি চলে যাবার পর কস্তুরীটা হাতে নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দারুণ খুশি খুশি লাগল মনটা। এক ঘণ্টা আগেও ভাবিনি, হঠাৎ আমি একটা কস্তুরীর মালিক হয়ে গেলাম। এটা যদি কারুকে উপহার দিই, সে কীরকম খুশি হবে! কাকে দেব?

কস্তুরীটার মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম, কোন্ এক অচেনা অরণ্যে হাজার-হাজার হরিণ ছুটে যাচ্ছে! ইস,

এত হরিণ কোন বনে থাকে ! হরিণগুলো ছুটে যাবার সময় প্রত্যেকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে যাচ্ছে। সে দৃষ্টিতে ঠিক ভয় নেই। ওরা বুঝি জেনে গেছে, আমার কাছে একটা কস্তুরী আছে। অর্থাৎ হাজার-হাজার 'কালো হরিণ চোখ' দেখছে আমাকে। হরিণগুলো মিলিয়ে যাবার পর দেখলাম, বনেব মধ্যে তকতকে-ঝকঝকে খানিকটা জায়গা, নরম ঘাস গালিচার মতো—সেখানে একটি মেয়ে বসে আছে, তার সারা গায়ে ফুলের গয়না—মেয়েটিকে যে কী অপূর্ব দেখতে, সে আর কী বলব ! আমাব মনে হলো, আমি শকুন্তলাকে স্বপ্ন দেখছি, কারণ একটা হরিণ সেই মেয়েটির কাছে দাঁড়াল, মেয়েটি হরিণটার গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করতে লাগল। কী আশ্চর্য, তার একটু দূরেই আমি দাড়িয়ে আছি। আমিই কী দুষ্মন্ত নাকি ? বড়জোর দুশমন হতে পারি...কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী ? মেয়েটি আমাকে অবাক করে উত্তর দিল, আমাব নাম কপালকুণ্ডলা। আমি ভাবলাম, কস্তুরীটা ওকেই উপহার দেওযা যায়—

স্বপ্নটা আরো অনেক বড় ছিল, সবটা বলার দরকাব নেই। আমাব ঘুম ভাঙাল আমার বন্ধু রজত। চোখ মেলেই বললাম, দ্যাখ, আজ সস্তায একটা কস্তুরী কিনেছি।

—কস্তুরী ? ভ্যাট।

—দ্যাখ, শুকে দ্যাখ, কী অপূর্ব গন্ধ।

রজত সেটা নিয়ে শুকে বলল, হ্যাঁ, একটা গন্ধ আছে বটে। ফুটপাথে এক টাকা চারআনা করে শিশি যে সেন্ট বিক্রি হয, তার চেযেও পচা গন্ধ।

আমি একটু দুঃখিত হয়ে বললাম, তা হতে পারে ! প্রকৃতির থেকেও মানুষ বেশি বুদ্ধিমান। প্রকৃতির তৈরি সুগন্ধের চেয়েও অনেক ভালো সেন্ট মানুষ তৈবি করতে পারে—

—ধ্যাৎ ! প্রকৃতি না হাতি ! এটা কস্তুরী তোকে কে বলেছে ?

কথা বলতে-বলতেই রজত নোখ দিয়ে খুঁটে ওই জিনিসটার গা থেকে চামড়াটা তুলে ফেলেছে। আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। রজত বলল, এই দ্যাখ। দেখলাম, ভেতরে কয়েক টুকরো পাথর, খানিকটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো ! হরিণের পেটে পাথর হলেও হতে পারে, কিন্তু বাংলা খবরের কাগজ সেখানে জন্মানো সত্যিই অসম্ভব।

রজত বলল, তুই এরকমভাবে ঠকলি ? তুই যে দিন-দিন কী বোকা হয়ে যাচ্ছিস।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম। পুরোপুরি ঠকিয়ে যেতে পারেনি। দুটাকা দিয়ে ওটা কেনার ফলে আজ দুপুরে অমন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলাম। তাই-বা কম কী ! দুটাকা দিয়ে কী স্বপ্ন কিনতে পাওয়া যায় ?

২

বাথরুমে ঢোকার আগে বাঁদিকে সুইচ। কিছুতেই সেটা জ্বালতে পারি না। শক্ত আঁট হয়ে যাচ্ছে। যত জোর দিয়েই সেটা নাড়াচাড়া করতে চাই—এক চুল নড়ে না।

স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, কী হলো?

—আলো জ্বালতে পারছি না! তোমাদের সুইচটা খারাপ!

স্বপ্না উঠে এসে বলল, ধ্যাৎ! খারাপ হবে কেন? এই তো—। স্বপ্না তার নরম আঙুলটা ছোঁয়াতে-না-ছোয়াতেই টুপ করে আলো জ্বলে উঠল। ভারী আশ্চর্য তো! আমার হাতে জ্বলল না কেন?

সুইচটা অফ করে আমি আবার নিজে জ্বালতে গেলাম। এবার বেশি জোরাজুরি না-করে, স্বপ্নার মতনই নরম ও আলতোভাবে। জ্বলল না—এবারও সেটা পাথরের মতন শক্ত! আমার হাতে ঐ আলো জ্বলবে না।

স্বপ্না তখন হাসতে-হাসতে সারা শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ফেলেছে! আমি খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললাম, এই সুইচটা শুধু মেয়েদের হাতেই জ্বলে। পুরুষদের জন্য নয় বোধ হয়!

তক্ষুণি রজত এগিয়ে এসে বলল, তুইও যেমন! এই দ্যাখ! রজত হাত দেওয়া মাত্র আবার আলো জ্বলে উঠল। এরপর আমি কতরকমভাবে চেষ্টা করলাম, নরমভাবে, গায়ের জোরে, এক আঙুল ছুঁইয়ে—কিছুতেই আমার হাতে জ্বলবে না সেটা।

এর একটাই মানে হতে পারে। ঐ সুইচটার কাছে একদিন আমি নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছিলাম, ও আমার ওপর খুব রেগে আছে। মনে-মনে হাত জোড় করে বললাম, হে সুইচ, না-জেনে তোমার প্রতি কখনো যদি কোন অন্যায় করে থাকি—আমায় ক্ষমা করো। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। এই বলে বাথরুমে চলে গেলাম।

ফিরে এসে খটাখট করে যতবার ইচ্ছে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম, নেভালাম, কোন অসুবিধে নেই। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে গেছে।

ত্রিপুরার আগরতলা এয়ারপোর্টের রানওয়ের পাশে ঝাঁক-ঝাঁক লজ্জাবতী লতা। প্লেন ছাড়তে একটু দেরি হবে, আমি ঐ লজ্জাবতী লতা নিয়ে খেলা করছিলাম। লজ্জাবতী নামটা ভারী সুন্দর, আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁলেই পাতাগুলো বন্ধ হয়ে যায়—এটা দেখতে আমার বেশ ভালো লাগে। জগদীশ বসু যে প্রমাণ করেছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে, তার তো এটাই সহজ আটপৌরে উদাহরণ!

প্রাণ তো আছেই, কিন্তু মন কী নেই?

আঙুল ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে আমি ওদের লজ্জা দিচ্ছিলাম, ওরাও লজ্জায় মুখ বন্ধ করে সঙ্গে-সঙ্গে নুয়ে পড়ছিল। হঠাৎ একটা গাছে হাত ছুঁইয়ে আমি অবাক। সে গাছটা লজ্জা পেল না, পাতাও গোটালো না। তবে কি এটা অন্য গাছ? না তো! বরং বলা যায়, একই লজ্জাবতী লতার একটা শাখা, অন্য শাখাটি লজ্জা পেয়ে মুখ বুজেছে, এর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বরাবরই আমার মনে খটকা ছিল, লজ্জাবতীদের বংশে একজনও কী নির্লজ্জা নেই? পুরো বংশটাই ওদের লাজুক, এতদিনেও কেউ বিদ্রোহ করেনি? আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই ওদের একজন সেটা দেখিয়ে দিল। লজ্জাবতীদের বংশে প্রথম নির্লজ্জা বেহায়া লতাটি আবিষ্কারের গৌরব আমার!

আমি আগে যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরে ছিল একটিমাত্র জানলা। সে ঘরে হাওয়া ঢোকে না। বাইরে প্রবল হাওয়া দিলেও আমার সেই ঘরে গুমোট গরম। সবাই বলত, মুখোমুখি দুটো জানলা না-থাকলে সেই ঘরে হাওয়া ঢোকে না নাকি। হাওয়ারা বন্দী হয়ে থাকতে চায় না, তারা এক জানলা দিয়ে ঢুকে অন্য জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তা তো হলো! কিন্তু আমার ঘরে যে দুটো জানলা নেই, সেটা হাওয়ারা ঘরে না-ঢুকেই জানল কী করে? তারা কী আমার একটিমাত্র জানলার বাইরে থেকে আগে উঁকি মেরে দেখে নেয় যে অন্য জানলা আছে কি না? নাকি, এ ঘর তৈরি হবার পরই প্রথমবার একদল হাওয়া এ ঘরে ঢুকে ভালো করে ইনসপেকশন করে গেছে এবং তারপর নানাজাতের সমস্ত হাওয়াকে জানিয়ে দিয়েছে, খবর্দার কেউ ঐ ঘরে ঢুকবে না, ও ঘরে একটিমাত্র জানলা! আশ্চর্য, কী ডিসিপ্লিন ঐ হাওয়াদের, এ পর্যন্ত আর কোন হাওয়া ভুল করেও একবারের জন্য ঢোকেনি এ ঘরে!

এখন যে-বাড়িতে থাকি, সে-বাড়িতে অবশ্য বেশ হাওয়া আছে, প্রত্যেক ঘরে তিন-চারটে জানলা। হাওয়া এবং বৃষ্টির জল দুই-ই সমানে ঢোকে। আমি লক্ষ করেছি, হাওয়া, বৃষ্টির জল এবং আমার টেবিলের কাগজপত্র—এই তিন ব্যাপারীর মধ্যে একটা গোপন চুক্তি আছে।

প্রথমে বেশ খানিকটা বৃষ্টির ছাট এল, ঘরের মধ্যে তিন-চারটে মিনিয়েচার সাইজের নদী বইতে লাগল। তারপর এক ঝলক দমকা হাওয়া, সেই হাওয়ায় উড়ে গেল আমার টেবিলের কাগজপত্র। এই কাগজগুলো উড়ে গিয়ে কোথায় পড়বে বলুন তো? ঘরের শুকনো জায়গাটুকুতে কক্ষনো না, ঠিক উড়তে-উড়তে গিয়ে পড়বে জলে। এতে কোন ভুল নেই।

কাগজেরও জাতিভেদ আছে। ধরা যাক, আমার একটা কবিতা লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। টেবিলে রয়েছে আমার সেই বহু উদ্বেগ ও পরিশ্রমের ফসল সেই কবিতা-লেখা কাগজটি, কয়েকটি চিঠি যার উত্তর না-দিলেও চলে, বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল, ডাইংক্লিনিং-এর রসিদ, আরো কিছু-কিছু।

কিন্তু দমকা হাওয়ায় ঠিক ঐ কবিতা-লেখা কাগজটি এবং ডাইংক্লিনিং-এর রসিদটাই উড়ে গিয়ে পড়বে জলে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেগুলো তুলে নেবার আগেই জলে ভিজে সব অক্ষর একাকার। আর বাকি অপ্রয়োজনীয় কাগজগুলো মহানন্দে হাওয়ায় অনেকক্ষণ উড়বে, কিছুতেই পড়বে না জলে। অথবা তারা টেবিল থেকে স্থানত্যাগই করবে না।

কাগজপত্র চাপা দিয়ে রাখার কথা বলছেন? তাড়াতাড়িতে কালির দোয়াত কিংবা আঠার শিশি কিংবা কাচের গেলাস চাপা দিয়ে দেখুন, কী ফল হয়! কালির দোয়াত কিংবা আঠার শিশি ওল্টাবেই, কাচের গেলাসটা ভাঙবেই নিচে পড়ে। অথচ, এগুলোর চেয়ে অনেক হাল্কা, একটা ছোটদের খেলনা রবারের কুকুর দিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে দেখেছি, কক্ষনো ওল্টায় না। রবারের জিনিস তো, ভাঙার চান্স নেই যে!

সেই জন্যই, এখন কোন ঘরে যদি দমকা হাওয়া বয়, বৃষ্টির ছাট আসে, আমি আর বৃথা কাগজপত্র সামাল দেবার চেষ্টা করি না। কবিতা লেখা কাগজটি উড়ে গিয়ে জলে পড়লে বুঝতে পারি, ওটার সদ্গতিই হয়েছে; ঐ পণ্ডশ্রমটুকু ছাপার যোগ্যই নয়। মনে-মনে বলি, হে পবন, হে বরুণ, আমি তো তোমাদের সঙ্গে কক্ষনো শত্রুতা করিনি! সুতরাং খেলাচ্ছলে যেটুকু নষ্ট করতে চাও করো, আমার বেশি ক্ষতি-টতি কোরো না। বাতাস এবং বৃষ্টির জলের যে প্রাণ আছে এবং তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বেশকিছুদিন আগে, আমি জড়পদার্থের খেয়ালখুশি নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। নিশ্চয়ই লেখাটাতে কিছু দোষের কথা ছিল। নইলে সেই লেখাটা লিখতে-লিখতেই আমার কলমটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিবটা বড়শি হয়ে যাবে কেন? কলমদের যে নিজস্ব অনেক অভিরুচি আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বেশিরভাগ লেখাই আমি নিজে লিখি না, আমার কলম লেখে। নইলে, একটা বিষয় ভেবে লিখতে শুরু করলে, সেটা সম্পূর্ণ অন্যদিকে নিয়ে যায় কে? আমার নিজেরই ডানহাত দিয়ে একই কলমে রোজ লিখছি, অথচ এক-একদিন হাতের লেখাটা যাচ্ছেতাই হয়ে যায়, এক-একদিন বেশ পরিচ্ছন্ন হয়—কী যুক্তি আছে এর? এক-একদিন কলমটা আবার ইচ্ছে করে কোথায় লুকিয়ে বসে থাকে।

আমরা চাবি হারাই, না চাবি আমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে লুকোচুরি খেলে? নইলে, যে ড্রয়ারটা আগে পাঁচবার খুঁজেছি, সেটারই এক কোণে কী করে চাবিটাকে খুঁজে পাওয়া যায়? আমরা অনেকে আরশোলা, চামচিকে বা টিকটিকিকে খুব ঘেন্না করি। এমনও হতে পারে, ওরাও কেউ-কেউ আমাদের ঘেন্না করে খুব! টিকটিকিরা সাধারণত মানুষের কাছে আসে না—ওরা মাংসাশী হলেও কোনদিন মানুষকে কামড়েছে, এমন শোনা যায়নি। দৈবাৎ কখনো-কখনো দেয়াল থেকে পা পিছলে দু-একটা টিকটিকি মানুষের গায়ে পড়ে—আমরা তখন ঘেন্নায় শিউরে উঠি। ওরাও তখন যেরকমভাবে কিলবিলিয়ে পালায়—তাতে একথা মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, মানুষ নামক অদ্ভুত জন্তুর শরীর স্পর্শ করার ফলে ওরা ঘেন্নায় গঙ্গায় চান করতে যায়!

অনেকে পলার আংটি পরে, অনেকের শুনেছি পলা সহ্য হয় না। গোমেদ, হীরে, রক্তমুখী নীলা—এগুলো নাকি ধারণ করলে কারুর-কারুর দারুণ উন্নতি হয়, কারুর আবার ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যায়। এসবই শোনা কথা, সত্যি কিনা জানি না। এসবের পক্ষে যে-যুক্তি দেওয়া হয়, তা অতি তুচ্ছ। তবে, একটা ব্যাপার আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। টাকা পয়সাও অনেকের সহ্য হয় না, যেমন আমার হয় না। টাকা পয়সা জাতীয় জিনিসগুলো আমাকে নিতান্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, ওরা আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না।

৩

রথীনদার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়ে আমি অবাক। এ কী চেহারা হয়েছে রথীনদার! মুখে দু-তিনদিনের খোচা-খোচা দাড়ি, জামার সবকটা বোতাম লাগানো নেই, এমনকী পায়ে চটি! রথীনদার এই পোশাক বিশ্বাসই করা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, রথীনদা, আপনার কী কেউ...

রথীনদা মুচকি হেসে বললেন, না, কেউ মারা যায়নি।

আমারও সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল, রথীনদার মা এবং বাবা দুজনেরই কেউই বেঁচে নেই। সুতরাং এটা তো অশৌচের পোশাক হতে পারে না।

—তাহলে আপনার কী হয়েছে রথীনদা?

—কী আবার হবে? কিছু হয়নি।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কী? চুপ করে বোস। কফি খাবি?

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে হুকুম দিয়ে আমাকে বললেন, একটু বোস, দু-একটা কাজ সেরে নিই।

অফিসে রথীনদার আলাদা এয়ার কণ্ডিশান করা ঘর। বিলেতফেরত ডাকসাইটে কস্ট-অ্যাকাউন্টেন্ট রথীনদা, প্রথমে একটা সাহেব কোম্পানিতে অফিসার হয়ে ঢুকেছিলেন, এখন সেই কোম্পানিই মারোয়াড়ি কিনে নিয়েছে, এখানে রথীনদা পদমর্যাদায় তৃতীয় ব্যক্তি। কোম্পানি ওঁকে গাড়ি দিয়েছে, এগারোশো টাকা বাড়িভাড়া দেয়। অফিসে ছ'দিন ছ'রকম স্যুট পরতেন রথীনদা, টাইয়ের গিঁট নিখুঁত, আর জুতোর পালিশের বাহার কী! পাইপ মুখে দিয়ে ঠিক সিনেমার সাহেবদের মতন ইংরিজি বলতেন।

কফি শেষ করে রথীনদা আমার দিকে একটা চার্মিনার বাড়িয়ে দিলেন। সেদিকে আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়েছি দেখে রথীনদা হাসতে-হাসতে বললেন, তোরাই শুধু চার্মিনার খেতে পারিস, আমরা পারি না? এখনো লাংসের জোর আছে!

অফিস থেকে বেরিয়ে রথীনদা বললেন, চল, কফি হাউসে গিয়ে একটু আড্ডা মারি। গাড়ি নেই, বাসে উঠবি, না হেঁটে যাবি?

মানুষের স্বভাব হঠাৎ বদলাতে দেখলে একটু ভয়-ভয় করে। রথীনদার উল্টোপাল্টা কথা শুনে আমার কীরকম গা ছমছম করতে লাগল। দাড়ি কামানো নেই, কথাবার্তা অন্যধরনের, রথীনদার কী শেষে মাথার গোলমাল টোলমাল হলো নাকি? ইস, গোপা বউদির তাহলে কী হবে?

আমি বললাম, রথীনদা, ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো! কফি হাউসে আড্ডা মারার ইচ্ছে তো আপনার আগে কোনদিন হয়নি?

রথীনদা বললেন, কেন, তোরা আড্ডা মারতে পারিস, আর আমরা পারি না? আমাদের কী প্রবেশ নিষেধ? নাকি আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি?

রথীনদার বয়েস পয়তাল্লিশ, বুড়ো মোটেই বলা যায় না। তবে এতদিন রথীনদা ছিলেন, যাকে বলে বয়স্ক দায়িত্ববান পুরুষ, সমাজের একটা উজ্জ্বল রত্ন। আজ সব এলোমেলো। রথীনদা তাঁর ভাবান্তরের কাহিনী শোনালেন একটু বাদে।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে দিন দশেক আগে। ঠিক ন'টার সময় অফিসে বেরোন, সেদিনও সেজেগুজে অফিসে বেরুতে যাচ্ছেন, গাড়িটা কিছুতেই স্টার্ট নিল না। কলকব্জা নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হলো, ঠেলাঠেলি হলো, গাড়ি তবু অনড় হয়ে রইল। অফিসের মেকানিককে টেলিফোন করে রথীনদা বিরক্ত হয়ে একটা ট্যাকসি ডাকতে পাঠালেন। অনেক খুঁজেও ট্যাকসি পাওয়া গেল না। অথচ অফিসে জরুরি কাজ আছে, দেরি করা যায় না। রথীনদা একটা বাসেই উঠে পড়লেন।

বোধহয় আট-নবছর বাদে বাসে উঠলেন। অফিসের সময় ভিড়ের বাসের কী অবস্থা হয় তা দূর থেকেই দেখেছেন—কিন্তু তার মধ্যে নিজে না-ঢুকলে ঠিক বোঝা যায় না। যারা নিয়মিত ঐসময় বাসে যায়, তারা তবুও কায়দা করে নিজেকে অটুট রাখতে পারে, কিন্তু যাদের অভ্যেস নেই...। রথীনদার আয়নার মতন পালিশ-করা জুতো ধুলোয় মাখামাখি, টাইটাতে গলায় ফাঁস লেগে যাবার অবস্থা, কোটের বোতাম ছিঁড়ে গেল, একহাতে অফিসের ব্যাগ, অন্যহাতে হ্যাণ্ডেল ধরা, এই অবস্থায় কণ্ডাকটার টিকিট চেয়ে বিরক্ত করতে লাগল, কী করে যে লোকে এইসময় পয়সা বার করে—

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, রথীনদা এতে বিরক্ত হলেন না। এই ভিড়ে চাপাচাপি বাস-জার্নি তাঁর ভালো লেগে গেল। আমায় বললেন, জানিস, সেই বাসে গোটা দশেক কলেজের ছেলে ছিল, নিজেদের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, কয়েকজন তো বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিল পাদানি থেকে। আমার কীরকম ঈর্ষা হলো ওদের দেখে। কুড়ি-বাইশ বছর আগে আমিও তো ওদের মতন ছাত্র ছিলাম, আমিও ঐরকম হৈ-চৈ করেছি—সেইসব দিন আমি আর ফিরে পাব না। নাইন্টিন ফিফটি টু-তে যখন লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিলাম—কী হুল্লোড়ই করেছি! আর এখন? জীবনটা একেবারে রুটিন বাঁধা!

শুনবি আমার রুটিন! সকালবেলা চা খাওয়া, দাড়ি কামানো আর কাগজ পড়া একসঙ্গে সারতে হয়। সময় নেই তো! সাড়ে আটটায় স্নান করতে ঢুকি, ন'টার সময় অফিস! অফিসে সারাক্ষণ একটা ঘেরাটোপের মধ্যে বসে থাকি—দু'-চারজন অফিসার আর মালিকদের সঙ্গে দেখা হয় শুধু—বাকি লোকজনের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। আমরা অফিসার তো, সব স্টাফদের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের মানায় না। সাহেবরা নেই, এখন আমরা দেশী সাহেব। অফিস থেকে সন্ধেবেলা ফিরে গা-টা ধুয়ে ঘরে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাই। কোনদিন একটু আধটু হুইস্কিতে চুমুক দিই। এর নাম রিলাকসেশান! আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কদাচিৎ যাই, অফিসের সম্পর্কের লোকেরাই মাঝে-মাঝে বাড়িতে বেড়াতে আসে, তখনো এসেও অফিসের কথা। মাসে দু-একদিন বউকে নিয়ে সিনেমা, কিংবা কোন পার্টিতে গিয়ে মাতালদের সঙ্গে দেতো হাসি হেসে গল্প করা—এর নাম আনন্দ! ছুটি কাটাতে যাই দার্জিলিং বা পুরী, পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে আসছে। একটা ইনসিওরেন্স কিছুদিন আগে মেচিওর করল, সেদিন বুঝতে পারলাম বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! চাকরির উন্নতি, টাকা জমানো আর বউকে খুশি করা—শুধু এই ক'টি জিনিসের বিনিময়ে বাকি পৃথিবীটা তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, আর এর বদলে পাব হার্টের অসুখ কিংবা ডায়াবিটিস! দূর ছাই!

গাড়িটা সারাতে দিনসাতেক সময় লাগবে। রথীনদা অফিস থেকে আর-একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারতেন কিংবা কোন অফিস-বন্ধুকে বলে লিফট নিতে পারতেন, নিলেন না। পরের দিন আবার উঠলেন ভিড়ের বাসে। সেদিন আর স্যুট-টাই পরেননি, সেরকম যত্ন নিয়ে জুতো পালিশ করাননি। সেদিন ভিড়ের মধ্যে অনেক সহজভাবে মিশে গেলেন।

বুঝলি নীলু, আমার মনে হলো দশ বছর বয়েস কমে গেছে। ঐ ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, চেঁচামেচি—এর মধ্যে মিশে গিয়ে মনে হলো, আমিও এদের একজন, অমনি পৃথিবীটা অনেক বড় হয়ে গেল। দুজন লোক বাসের মধ্যে ঝগড়া করছিল, আমি অমনি একজনের সাইড নিয়ে নিলাম, আর তক্ষুনি আমার মধ্যে একটা সেন্স অব বিলংগিং এসে গেল।

দু-চারদিন বাদে সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রথীনদার থুতনির কাছে খানিকটা কেটে গেল ঘচাং করে! পরের দিন সেখানটায় বেশ ব্যথা, দাড়ি কামানো অসুবিধাজনক। দাড়ি না-কামিয়ে অফিস যাওয়া তো দূরের কথা, রাস্তায় বেরুবার কথাও কয়েকদিন আগে কল্পনাই করতে পারতেন না। কিন্তু সেদিন মনে হলো, কী এমন রামায়ণ-মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এতে? গত পনেরো বছর ধরে প্রত্যেক দিন দাড়ি কামাচ্ছেন একটি দিনও বাদ পড়েনি—কে বলে মানুষ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ তো এখনো নিয়মের ক্রীতদাস! দাড়ি না-কামিয়েই সেদিন অফিসে বেরিয়ে পড়লেন, সেদিন আর জুতো মোজাও পরলেন না, স্রেফ চটি। বুঝলি সেদিন আমি ভিড়ের বাসে খুব চমৎকার মানিয়ে গেলাম। নিজেকে মনে হলো সবারই মতন একজন সাধারণ মানুষ! নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবার মধ্যেও যে এত আনন্দ আছে—

—রথীনদা, অফিসে আপনাকে কেউ কিছু বলেনি?

—কে কী বলবে? কার কী বলার আছে? আমার কাজটা আসল না পোশাকটা? আমার যা খুশি আমি তাই পরব। একটা আর্দালি যদি বগল-ছেঁড়া জামা পরে অফিসে ঘুরতে পারে, আমি চটি পায়ে দিয়ে আসতে পারি না? কে এরকম নিয়ম করেছে?

—না, না, সেকথা বলছি না। আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? মানে বলছিলাম কী, মালিকরা কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি?

রথীনদা একগাল হেসে বললেন, সবারই ধারণা আমার বাবা বা মা কেউ মারা গেছে। যেন শোকের জন্যই শুধু দাড়ি কামানো বন্ধ করতে পারে, আনন্দের জন্য পারে না! ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তাকে বললাম, এটাই এখন লেটেস্ট ফ্যাশান! বড়জুলপি রাখা এখন পুরোনো হয়ে গেছে, এখন

ফ্যাশান হচ্ছে, দু-তিনদিন অন্তর দাড়ি কামানো আর রবারের চটি পরা!

—গোপা বউদি এ সম্বন্ধে কিছু বলছেন না?

—তোর বউদির ধারণা, আমার মাথার দু-একটা স্ক্রু বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে। ডাক ছেড়ে কাঁদবে কিনা ভাবছে। আমি কিন্তু বেশ আছি, জানিস নীলু! এই কদিনে অনেক বয়েস কমে গেছে, মনে হয়—যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই, মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খাই, অচেনা লোকের সঙ্গেও কথা বলি! কাল তো ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে এলাম। অনেকে হয়তো বলবে, আমি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভেড়ার চেষ্টা করছি। তা বলুক। আমি তো আনন্দ পাচ্ছি! চ, পার্কে গিয়ে আলুকাবলি খাই!

পরের রবিবার সকালবেলা রথীনদার বাড়িতে গেলাম। দরজা খুলে দিলেন গোপা বউদি, খুবই বিরস মুখ। ভেতরের একটা ঘরে ধুপধাপ করে আওয়াজ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, বউদি, রথীনদা কোথায়? ওখানে আওয়াজ কিসের?

গোপা বউদি বললেন, যাও, ও ঘরে যাও! গিয়ে দ্যাখো তোমার দাদার কীর্তি।

ও ঘরে ঢুকেই থমকে গেলাম। রথীনদার ছ'বছরের ছেলে বিল্টুর হাত ধরে রথীনদা সারা ঘর জুড়ে লাফালাফি করছেন। পরনে অ্যাণ্ডারওয়ার আর গেঞ্জি। আমাকে দেখে বললেন, আয়! ওখানে চুপ করে বসে থাক!

—এটা কী করছেন কী?

—বিল্টুর সঙ্গে খেলা করছি!

—এইরকম নেচে-নেচে?

—বুঝলি না, খেলাও হচ্ছে, আবার একটু একসারসাইজও হয়ে যাচ্ছে। এই বয়েসে তো আর ডন-বৈঠক শুরু করতে পারি না—ওসব একঘেয়ে জিনিস করা সম্ভবও নয়! তার বদলে নাচটাই বা মন্দ কী! বেশ গা গরম হয়ে যায়, শরীর ঝরঝরে লাগে। ক'দিন ধরে এটা করছি। বিল্টু আগে একা-একা খেলা করে মনমরা হয়ে থাকত—কেন যে এটা আমার আগে মনে পড়েনি!

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসের একজন ধুমসো মতন লোককে হঠাৎ সারা ঘর জুড়ে নাচানাচি করতে দেখলে যে-কেউ ভাববে, লোকটি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হলো, মানুষের মধ্যে এরকম একটুআধটু পাগলামি থাকা বোধ হয় খারাপ নয়। অন্তত, একঘেয়েমির চেয়ে অনেক ভালো!

৪

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে প্রিয়ব্রত। পিয়ন এসে প্রিয়ব্রতকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। খাঁকি রঙের খাম, রেজিস্টার্ড, সই করে নিতে হলো। প্রিয়ব্রত তিন বছর ধরে বেকার বসে আছে, আজ তার কাছে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি এসেছে।

এখন, কোন গল্পলেখক এই দৃশ্যটা বর্ণনা করতে হলে কীভাবে লিখবেন? হয়তো, অনেকটা এইরকম। চিঠিটা খুলে পড়ার সময় প্রিয়ব্রত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যিই চাকরি? তারই নামে? কোন ভুল হয়নি তো? দুবার তিনবার পড়ল চিঠিখানা আগাগোড়া, ঠিকানা লেখা খামখানা দেখল উল্টেপাল্টে—তারপর যখন নিঃসন্দেহ হলো, তখন এক ঝলক রক্তের মতন খুশি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে-চোখে।

তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে। প্রিয়ব্রতর মা তখন বাথরুমে—তবু বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, মা, শিগগির এসো—চাকরি! চাকরি পেয়ে গেছি! সেই যেটা দুমাস আগে ইনটারভিউ দিয়েছিলাম—কোন আশাই ছিল না—একেবারে অ্যাপয়েনটমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে—সামনের সোমবার জয়েনিং—

প্রিয়ব্রতর দাদার ছেলে সন্তু এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে কাকু?

সন্তুকে আজ সকালেই এক চড় মেরেছিল প্রিয়ব্রত। এখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে-করতে বলল, কাকু, আমি চাকরি পেয়েছি! এবার থেকে আমিও তোমার বাবার মতন অফিস যাব!

প্রিয়ব্রতর দিদি ভেতরের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। খুশির চোটে প্রিয়ব্রত চিরুনি কেড়ে নিয়ে চুল এলোমেলো করে দিল দিদির। ওর দিদি চেঁচিয়ে উঠল এই-এই, কী হচ্ছে কী! হঠাৎ এত আনন্দ উথলে উঠল কেন?

প্রিয়ব্রত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এবার আমি চাকরি পেয়ে গেছি! তোর সব ধার শোধ করে দেব!

—চাকরি পেয়েছিস? ইঃ! দেখি চিঠি দেখি!

—কেন চিঠি না-দেখলে বুঝি বিশ্বাস হয় না? আমি যে বলছি...তোর কাছে কত ধার আছে বল—

—ধারশোধের কথা পরে, কবে খাওয়াচ্ছিস বল?

নাঃ, ঠিক হচ্ছে না আমার। কোন গল্পলেখক লিখলে বানিয়ে-বানিয়ে আরো অনেক সুন্দর করে লিখতে পারতেন। আমি একদম বানাতে পারি না—তাই গল্প-উপন্যাস লেখা হল না আমার!

আসল ঘটনাটা যা ঘটল, তা এইরকম। পিয়নের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে প্রিয়ব্রত দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ল। পড়ল বেশ মনোযোগ দিয়ে। তারপর নিস্পৃহভাবে চিঠিখানা চিঠির বাক্সর ওপর রেখে কলমটা নিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ভাঙতে লাগল দরজার কোণায় একটা বোলতার বাসা।

আমি আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি বললাম—প্রিয়ব্রত, দেখো, বোলতা যদি একবার হুল ফোটায়—

ও বলল, একদম দরজার কোণে বাসা করেছে, দরজা খুললেই বোলতাগুলো বেরিয়ে এসে মাথার কাছে এমন ভন-ভন করে—!

প্রিয়ব্রতর দাদা সুব্রত এই সময় এল বাইরে থেকে। লেটারবাক্সের ওপর খামখানা দেখে জিজ্ঞেস করল, কার চিঠি রে?

—আমার।

—আবার কোন জায়গা থেকে ইনটারভিউতে ডেকেছে নাকি?

—না, একটা অ্যাপয়েনটমেণ্ট লেটার পাঠিয়েছে!

—কোথা থেকে? দেখি, দেখি!

প্রিয়ব্রতর ঐ নির্লিপ্ত ভঙ্গি দেখে আমি নিজেও না অবাক হয়ে পারলাম না। এই ক'বছর প্রিয়ব্রত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, চেনাশুনো কোন লোকের কাছে অনুরোধ জানাতে বাকি রাখেনি। আর আজ চাকরি পেয়েও তার কোন ভাবান্তর নেই!

সুব্রত চিঠিখানা পড়ে বলল, বাঃ, এ তো বেশ ভালোই অফার দিয়েছে! তাড়াতাড়ি একটা উত্তর লিখে দে!

—আচ্ছা দেব।

—আজই দিয়ে দে। দেরি করিসনি! মাকে বলেছিস?

—বলব এখন! মা চান করতে গেছে।

সুব্রত ভেতরে চলে গেল, প্রিয়ব্রত আবার কলম দিয়ে বোলতার বাসা ভাঙতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয়ব্রত, কোথায় চাকরি পেলে?

আমার দিকে না-তাকিয়েই উত্তর দিল, এই, এ. জি. বেঙ্গলে একটা ইনটারভিউ দিয়েছিলাম—ওরা অ্যাপয়েনটমেণ্ট পাঠিয়েছে।

বাঃ, খুব ভালো জায়গাতেই তো পেয়েছো। কংগ্রাচুলেশনস! কবে খাওয়াচ্ছো বলো?

উত্তর না-দিয়ে প্রিয়ব্রত শুধু একটু ফ্যাকাশেভাবে হাসল।

এরপর দু-তিনদিন প্রিয়ব্রতকে আমি দূর থেকে লক্ষ করেছি। চাকরি পেয়েও তার কোন ভাবান্তর নেই, মুখে চোখে একটুকু উল্লাসের ছাপ নেই। বরং তাকে

আগের চেয়েও যেন একটু বেশি ম্লান দেখায়। এ ক'বছরে প্রিয়ব্রত অন্তত তেইশ-চব্বিশবার ইনটারভিউ দিয়েছে, দরখাস্ত পাঠিয়েছে অন্তত শ'খানেক—সেই তুলনায় যে চাকরি সে পেয়েছে, এমন কিছু খারাপ নয়—তবু এরকম কেন?

আমার তখন আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প মনে পড়ল। সেই কলসীর দৈত্যের কাহিনী। কলসীর মধ্যে বন্দি অবস্থায় দৈত্য সমুদ্রে ডুবে ছিল। প্রথম একশো বছর সে মনে-মনে ঠিক করেছিল, যে তাকে উদ্ধার করবে, তাকে সে রাজা করে দেবে। কেউ উদ্ধার করল না। পরের একশো বছর ঠিক করল, যে তাকে উদ্ধার করবে, তাকে সে পৃথিবীর সব সম্পদ আহরণ করে এনে দেবে, তার সে ভৃত্য হয়ে থাকবে। কেউ তখনো তাকে উদ্ধার করল না। পরের একশো বছর দৈত্য মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, উদ্ধার পেলেই সে ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে—এমনকী তার উদ্ধারকারীকেও সে হত্যা করবে।

মনে হলো, প্রিয়ব্রতর বোধ হয় সেই অবস্থা। এতদিন চাকরি না-পেয়ে-পেয়ে সে হিংস্র হয়ে উঠেছে—চাকরি জিনিসটার ওপরেই তার ঘৃণা জন্মে গেছে। ভয় পেলাম এই ভেবে যে, প্রিয়ব্রত না শেষ পর্যন্ত চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

আমাদেরই পাড়ার মেয়ে নবনীতার সঙ্গে প্রিয়ব্রত প্রেম ট্রেম করে, আমি জানতাম। সেদিন দুপুরবেলা দেখলাম লেকে একটা বেঞ্চিতে ওরা দুজনে বসে আছে। চারদিকে কাঠফাটা রোদ্দুর, কিন্তু ওদের মাথায় জামরুল গাছের ছায়া। যে-কোন লেখক এই দৃশ্যটা কী রকমভাবে আঁকতেন? নতুন চাকরি-পাওয়া একটি ছেলে দুপুরে দেখা করেছে তার প্রেমিকার সঙ্গে। ওরা এখন খুশিতে উচ্ছল, ওরা ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা করছে। দিদির কাছ থেকে টাকা ধার করে এনেছে প্রিয়ব্রত, আজ সে নবনীতাকে নিয়ে শৌখিন কোন দোকানে খেতে যাবে।

আসল দৃশ্যটা কিন্তু সেরকম নয়। ওরা দুজনেই বসে আছে নীরস-গম্ভীর মুখে, দেখলেই বোঝা যায়, কী নিয়ে খুব একচোট ঝগড়া হয়েছে ওদের মধ্যে। থমথমে চোখে নবনীতা তাকিয়ে আছে জলের দিকে, আর প্রিয়ব্রত একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

বড় রাস্তার মোড়ে প্রিয়ব্রত রোজ সন্ধেবেলা একদল বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়। ওরা সবাই বেকার, ওদের সবারই চমৎকার স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমান সপ্রতিভ চেহারা, পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো—কিন্তু কেউ চাকরি পায় না। প্রিয়ব্রতই ওদের মধ্যে সৌভাগ্যবান। সে তবু তিনবছরের মধ্যে চাকরি পেয়েছে।

সন্ধেবেলা আজও প্রিয়ব্রতকে দেখলাম সেই দলে। গল্প-লেখকরা হয়তো এখানে বর্ণনা করতেন যে প্রিয়ব্রত সগর্বে তার বন্ধুদের কাছে চাকরির গল্প করছে—তার আসল মাইনের চেয়েও বাড়িয়ে বলছে অনেক—। কিন্তু সেরকম

কিছুই হচ্ছে না এখন। ওর বন্ধুরা অন্য দিনের মতনই নানা গল্পে মশগুল—প্রিয়ব্রত একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিমর্ষ মুখে, তার চেহারায় একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

এবার আমি প্রিয়ব্রতর মন খারাপের কারণ বুঝতে পারলাম। সে একা চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তার সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও তার বন্ধুরা কেউ এখনো চাকরি পায়নি। চাকরি পেয়ে প্রিয়ব্রত ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা তার একধরনের স্বার্থপরতা। এইজন্যই তার মনের মধ্যে এরকম অপরাধবোধ। দেশে এখন এত বেকার—এর মধ্যে হঠাৎ একজন কেউ চাকরি পেলে, তার গর্বের বদলে লজ্জা পাবারই কথা।

৫

ছেলেটিকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কী, মৃত্যুটাকে নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হয় না? মাঝে-মাঝেই ইচ্ছে করে না, দুম করে হঠাৎ মরে গেলে কেমন হয়?

সেকথা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি, আমরা অন্যকথা বলছিলাম।

ছেলেটির বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশি নয়, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। অর্থাৎ ওর বয়েস আমার ঠিক অর্ধেক। সতেরো-আঠারো বছর আগে আমিও কলেজের ছাত্র ছিলাম। ওকে দেখে, আমার প্রথম কলেজ জীবনের কথা মনে পড়বেই। একটু মিলিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করছিল।

একটা ব্যাপারে প্রথমেই মিল পেলাম। আমি ওকে আপনি বলে সম্বোধন করছিলাম, ও কোন আপত্তি করেনি। বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে আপনি বলছেন কেন, আমি তো অনেক ছোট, আমাকে তুমি বলবেন—এধরনের কথা সেই প্রথম যৌবন থেকেই আমার পছন্দ হয় না। আমাকে সেই তখনই কেউ 'তুমি' বললে চটে যেতাম। আমিও এখনো কোন কলেজের ছেলেমেয়েকে তুমি বলি না। ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলে, চাণক্যের নীতি অনুযায়ী সবাই সাবালক, তখন সকলকেই সমান মানুষ হিশেবে সম্মান দেখানো উচিত। আপনি থেকে তুমি হবে বন্ধুত্ব গাঢ় হবার হিশেবে—তার সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক?

আর-একটা ব্যাপারেও ওর সঙ্গে আমার মিল আছে। আমার সামনে সিগারেট খাবার ব্যাপারে তার কোন দ্বিধা নেই। আমি অবশ্য কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দুবছর একটাও সিগারেট খাইনি—তার কারণ, প্রথম-প্রথম দেখেছি, যতসব বাজে বখাটে ছেলেরাই সিগারেট খায়। আমার ধারণা ছিল, সিগারেট খাওয়া আজেবাজে ছেলেদেরই স্বভাব। থার্ড ইয়ারে উঠে যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো সে ছিল চেইন

[redacted]

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ভালো ছেলে খারাপ ছেলে হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, আমিও দু-একটা টানতে শিখলাম, তখন থেকে আমি আর গুরুজনদের দেখে সিগারেট লুকোই না। যেসব গুরুজন মনে করেন, ছোটরা তাঁদের সামনে সিগারেট টানলে তাঁদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে—তাদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ঠুনকো, এবং সেই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য নয়।

ছেলেটির সঙ্গে আমার অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। কিন্তু আমি মনে-মনে তাকে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলাম। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন, মৃত্যুটা নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হয় না? আমাদের হতো। এতদিন যে বেঁচে আছি, সেটা নেহাৎ অ্যাকসিডেন্ট! স্কুল-কলেজে পড়ার সময় যে-কোনদিন মরে যেতে পারতাম! তাও, ভয় না-পেয়ে, দুঃখ না-পেয়ে, এমনিই হাসতে-হাসতে! প্রায়ই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হতো, অকারণে! তাছাড়া এমন সব কাজের ঝুঁকি নিতাম, মৃত্যু আসতে পারত যে-কোন সময়! কেন কলেজের চারতলায় বারান্দার রেলিং-এ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যালান্স করে, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে একটা চোদ্দ লাইনের পুরো কবিতা পড়েছিলাম? একটু পা হড়কালেই চিড়েচ্যাপ্টা হতাম! স্কুলে পড়ার সময় থেকে মিছিলে গেছি। স্কুলে পড়ার সময়েই গেছি ইউনিভার্সিটির সামনে বিক্ষোভ জানাতে—তখন ব্রিটিশ আমল, ঘোড়সওয়ার সাহেব-পুলিশ চার্জ করল একেবারে মিছিলের মধ্যে, আমরা ছুটতে-ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম সিনেট হলের পাশে একটা ক্যান্টিন ছিল সেই গলিতে—দমাস করে একটা গুলি লালরঙের লোহার দরজা ফুটো করে দেয়ালে এসে লাগল। সেই দেয়ালে আমরা দশ-বারোজন দাঁড়িয়ে—আমরা যদি চার ইঞ্চি লম্বা হতাম—আমাদের একজনের মাথা ফুটো হয়ে যেত! কিন্তু ভয় পাইনি—তার পরের দিন আবার প্রতিবাদ মিছিলে গেছি।

স্বাধীনতার পর 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ!' স্লোগান দিয়েছি, ট্রাম আন্দোলনের সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে কী ইঁট মেরেছিলাম পুলিসের দিকে! বি-এ পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে আমাদের এক বন্ধুকে অ্যারেস্ট করল, তাকে ছাড়াবার জন্য থানায় গেছি, ও-সি বললেন, ধরো এটাকেও!

ছেলেটিকে অবশ্য কথাটা আমি জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু তার ব্যবহার ও

মেয়েকে দেখে বুক কাঁপে ? আমাদের তুলনায় এখনকার ছাত্ররা মেয়েদের সঙ্গে অনেক বেশি মেশার সুযোগ পায়। আলাপ করার ব্যাপারে দ্বিধা অনেক কম। আমি পাছে মেয়েদের সঙ্গে মিশে বখে যাই, সেইজন্য আমার বাবা আমাকে কো-এডুকেশনাল কলেজে পড়তেই দেননি। তাতেও কি তিনি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আটকাতে পেরেছিলেন ? কোন বাবা মা'ই পারেন না, তবু ভুল করেন। পাড়ার মেয়ে, বন্ধুর বোন—এসব তো আছেই—তাছাড়াও কলেজের মর্নিং সেকশনে যে-মেয়েরা পড়ত, তাদেরও দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। ওয়াল ম্যাগাজিন, কলেজ সোশ্যাল পার্টি মিটিং, থিয়েটার, সরস্বতী পুজো ইত্যাদি কত সুযোগ ছিল মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার। সুতরাং, মেয়েদের দেখলেই বিগলিত হবার অবস্থা ছিল না। তবুও, কোন একটি বিশেষ মেয়েকে—দূর থেকে দেখলেই বুকটা কেঁপে উঠত, হঠাৎ তার হাতের লেখা কোথাও দেখলে সারা শরীর শিরশির করে উঠত। অনেক স্মার্টনেস সত্ত্বেও কখনো-কখনো সেই বিশেষ একটি মেয়ের মুখোমুখি হয়ে গেলে বোকা-বোকা হয়ে যেতাম।

এখন ছেলেমেয়েদের মেলামেশা অনেক সহজ, এখনো কারুর জন্য কারুর বুক কাঁপে ? নাকি সবই সহজ ব্যাপার ? এখন অনেক জায়গায় ছাত্ররা ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে তুই-তুই বলে কথা বলে। এটাও এমন কিছু নতুন নয় আমার কাছে। আমরাও কোন মেয়েকে আদর করার জন্য বা রাগাবার জন্য বলতাম, কিরে খুকি !

খিস্তিখাস্তা কিংবা রাস্তাঘাটে মেয়েদের আওয়াজ দেওয়ার ব্যাপারেও নতুনত্ব খুব বেশি নেই। আগেও ছেলেরা দিত, এখনো দেয়। তবে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে খিস্তি শ্ল্যাংয়ের মাত্রা কি বেড়েছে ? যত রাজ্যের অশ্লীল রসিকতা তখন আমাদের মধ্যে চালু ছিল, কিন্তু রসিকতা ছাড়া নিছক খিস্তি আমাদের দলের বন্ধুরা কেউ দিত না। তবে, কয়েকদিন আগে, বাসের দোতলায় একদল ছাত্র মেয়েদের সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করেছিল—কিন্তু দারুণ চতুর আর চোখা-চোখা মন্তব্য, আমার মোটেই খারাপ লাগেনি। ঐ বয়েসে মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা একটু বেশি উৎসাহী হয়ে উঠবেই, দল বেঁধে থাকলে কিছু চ্যাংড়ামি করবেই—তবে সে ব্যাপারটাও যদি তারা বুদ্ধিমানের [illegible] করে তবে জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় দেবে। [illegible] ওচা কিংবা [illegible]কারাই মেয়েদের দেখলে নিছক কুৎসিত কথা ব[illegible] [illegible]বা মুখ লুকোয়।

পড়াশুনো [illegible]কার তুলনায় এখন কেমন [illegible]চ্ছে, সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পড়াশুনো আমরাও করিনি, ওরাও করে না। কোনকালে আবার কলেজের ছেলের মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে। সেই গাছতলায় টোলফোল যখন

9470

ছিল, তখন বোধ হয় সবাই মন দিয়ে পড়াশুনো করত—কলেজ বিল্ডিং যবে থেকে হয়েছে, তখন থেকেই পড়াশুনোর ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কলেজজীবনে পড়াশুনোর চেয়ে অন্যান্য অনেক ব্যাপারই বেশি জরুরি—সেই স্বদেশি আমল থেকে—শুধু-শুধু লোকে একালের ছাত্রদের দোষ দেয়। চিরকালই কয়েকজন করে ছাত্র অভ্যেসবশত বাড়িতে পড়াশুনো করে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়ে যায়, কিছু ছাত্র সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার আগে প্রাণপণে ম্যানেজ দিয়ে ঠিক পাস করে যায় (আমরা ছিলাম এই দলে) আর কিছু বোকা ছেলে ফেল করে। ফেল করার জন্য বড্ড বেশি বোকা হওয়া দরকার। পরীক্ষার হলে টোকাটুকির ব্যাপারটাও নাকি অনেক বেড়েছে এখন, শুনতে পাই। আমাদের সময়ও কেউ-কেউ টুকত, কিন্তু আমরা জানতাম যাদের পাস করার কোন আশা নেই, তারাই টুকে সান্ত্বনা পায়। টুকে কেউ পাস করেছে কিংবা ভালো রেজাল্ট করেছে, একথা জীবনে শুনিনি! এখন করে শুনলে সত্যি আশ্চর্য হব!

এখন ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির ঝোঁক বেড়েছে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় না। এটাকেও স্বাভাবিক মনে হয়। তবে, আমাদের সময় রাজনীতি ছিল অনেক সরল—দল ছিল মাত্র দুটি, অর্থাৎ সব সময় আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল একটাই। এসটাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরাও অসহ্য রাগ পোষণ করতাম। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই ব্যবস্থা বদলাতে হবে। কিন্তু সেই বদলের পথ নিয়ে এত মতবিরোধ, এত দলাদলি ছিল না। এখন এত দলাদলির মর্ম বুঝতে পারি না, মনে হয়, আসল উদ্দেশ্যটাই পিছিয়ে যাচ্ছে।

তবে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে হয়। ছাত্ররা পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনি করছে কী করে? এই ব্যাপারটা আমাদের সময়ের চেয়ে একেবারে আলাদা। আমাদের সময়, একজন ছাত্রের গায়ে যদি কেউ হাত দিত তক্ষুণি আমরা পুরো ছাত্রসমাজ একজোট হয়ে যেতাম। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি থাকলেও ছাত্র বলতেই বোঝাত একটা দল। অন্য সবাই ছাত্রদের সাঙ্ঘাতিক ভয় করত এইজন্য। ছাত্রদের মধ্যে এত ভেদাভেদ, এত দলাদলি আমরা দেখিনি। নিজেদের মধ্যে মতের পার্থক্য ছিল, প্রচণ্ড তর্কাতর্কি কিংবা ঘুঁষোঘুঁষিও হতো—পরে আবার মিটমাট করে নেওয়া ছিল ব্যাপারটা মূলক, মতের পার্থক্যটাকে আমরা ব্যক্তিগত রেষারেষির পর্যায়ে আনিনি। বোমা কিংবা ছোরাছুরির এত ব্যবহার ছিল না, তাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় একজন ছাত্র আর-একজন ছাত্রকে খুন করে ফেলেছে—এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আগে পুলিসের গুলিতে একটি ছাত্র মারা গেলে আমরা হরতাল ডেকে তুমুল কাণ্ড বাধাতাম! চাঁদা তুলে টাকা দিতাম তার

পরিবারকে, তার মাকে গিয়ে বলতাম, আমরাও আপনার ছেলের মতন। ও গেছে, কিন্তু আমরা আছি! আর এখন? প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে দু'-একজন করে ছাত্র মারা যায়—কেউ পরের দিন তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের কথা অন্য ছাত্ররা ভুলে যায়—এ ব্যাপার আমরা কখনো দেখিনি, স্বীকার করছি, এটা সম্পূর্ণ নতুন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। খুব শৈশবে, আমরা সবাই প্রায় অকারণে অনেক নিষ্ঠুরতা করি। বেড়ালকে ছুড়ে ফেলেছি জলে, কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে হাততালি দিয়েছি, গুলতি দিয়ে মেরেছি শালিক পাখি, রাস্তার গরুর ল্যাজ মুড়িয়েছি, মাকড়সা ধরে ঠ্যাং ছিঁড়েছি, টিকটিকির ল্যাজ কেটে নিয়েছি, কুকুর-বেড়াল দেখলেই ক্যাঁৎ করে লাথি মেরেছি। এখন মানুষকে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, জন্তু জানোয়ারের প্রতি মায়া দয়া বেড়েছে। এখন আহত চড়াই পাখির সেবা করতে ভালো লাগে, মাকড়সাটাকেও আস্তে-আস্তে তাড়া দিয়ে দেয়ালের ওপর দিকে তুলে দিই। মনে হয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যখন অপরিণত থাকে, তখনই সে অনাবশ্যক হিংসার আশ্রয় নেয়। বোধশক্তি যখন আসে, মানুষ তখন ভালোবাসতে শেখে, তখন নিষ্ঠুরতাটা নিতান্ত স্থূল হয়ে যায়। অপরিণত কিংবা বিকৃতমস্তিষ্করাই যুক্তিহীন হিংসার আশ্রয় নেয়। নিজের প্রাণ দিয়ে দেবার ইচ্ছের মধ্যে একটা তেজ ও দীপ্তির পরিচয় আছে, কিন্তু অন্যের প্রাণহরণের ইচ্ছেটা মানুষের এত কালের সভ্যতার পরিপন্থী।

তাছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য নিশ্চিত মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। এটা একটা ব্রতের মতন, এ কাজ যিনি নেবেন তাঁকে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হবে, অনেক সহিষ্ণু ও সংযমী হতে হবে—কারণ, তিনি তো আর-পাঁচজন মানুষের মতন নন—আর সবাই তো নিজের-নিজের ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। যিনি ঐ ব্রত নিয়েছেন, নরহত্যাকারীর ভূমিকায় আমি তাঁকে কিছুতেই মানাতে পারি না। যে আদর্শের জন্যই হোক, কোনো মানুষকে খুন করার গ্লানি কখনো মুছতে পারে না। খুনী কখনো আদর্শবাদী হতে পারে না।

কিংবা, আমি হয়তো এসব কিছুই বুঝি না।

৬

দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না!

এই একটা বাক্য যে জীবনে কতবার কত লোকের মুখে শুনলাম! কেন যে ভালো

লাগে না, কিংবা কি হলে যে ভালো লাগতো, তা কেউ বলতে পারে না।

কফি হাউসে চারজন ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছিল। চারজনেরই পোশাক-টোশাক বেশ ভালো, সুলক্ষণযুক্ত মুখ, কাপের পর কাপ কফি আসছে, অনবরত পুড়ছে সিগারেট। সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতি, প্রফেসারের সমালোচনা ইত্যাদি কতরকম বিষয় আসছে, চলে যাচ্ছে, আমি শুনছি পাশের টেবিল থেকে। দারুণ উৎসাহে ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে চেয়ারটা পেছনদিকে হেলিয়ে বলে উঠল, দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না!

আমি মেয়েটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালাম, ওকে বোঝার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

মনে পড়ল, এই কথাটা আমি গতকালই শুনেছি। গতকাল বসন্তদা আমাকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসন্তদা মস্ত বড় চাকরি করেন। একটা বিলিতি কোম্পানিতে দুনম্বর বস। মাঝে-মাঝে ওর বাইরে খাওয়ার শখ হয়, বিশেষত বউদি বাপের বাড়ি গেলে। তখন আর বাড়িতে বাবুর্চির রান্না ওর মুখে রোচে না, হোটেলের বাবুর্চির রান্নাই পছন্দ হয়।

পার্ক স্ট্রিটে একটা জমকালো হোটেলে নিয়ে এলেন আমাকে—যেরকম হোটেলে আমি একা-একা ঢোকার সাহসই পাব না কখনো, তাছাড়া পকেটে অত পয়সা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না!

খাবারের অর্ডার দেবার আগে বসন্তদা হুইস্কির অর্ডার দিয়ে বসলেন। ঠাণ্ডা ঘর, মৃদু আলো, সুবেশ নরনারী—বাইরের গোলমাল বা চিটচিটে গরম—কিছুই এখানে টের পাওয়া যায় না। বসন্তদা হুইস্কির গেলাসে মৃদু চুমুক দিতে লাগলেন—আর আমি, ইয়ে, আমি খাচ্ছিলাম লেবুর রস—সাধারণত লেখকদের ওটাই খেতে হয় কিনা!

বেয়ারাকে ডেকে সিগারেট আনতে দেবার জন্য বসন্তদা মানিব্যাগ বার করলেন—আমি দেখলাম, সেখানে থরে-থরে নোট সাজানো। বসন্তদাকে বেশ সার্থক মানুষ বলা যায়—অর্থাৎ সাধারণ জীবনে সার্থকতা বলতে যা বোঝায়। যোধপুরে ফ্ল্যাট কিনেছেন, ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে, দুবছরে একবার বিদেশে যান অফিসের কাজে। বসন্তদা কলকাতা শহরের দোষ গুণ নিয়ে আলোচনা করতে-করতে বললেন, যাই বলিস, এ শহরটার একটা নেশা আছে, আমি তো বিদেশে গেলেও—

কথায়-কথায় বেশ রাত হয়ে গেল। খাদ্যদ্রব্য শেষ হবার পর বসন্তদা আবার পানীয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন। ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বললাম, বসন্তদা, চলুন, এবার বাড়ি যাওয়া যাক!

—দাঁড়া, দাঁড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

—না, চলুন, বেশ রাত হয়ে গেল!

বসন্তদা সিগারেটটা বেশ বড় অবস্থাতেই অ্যাশট্রেতে গুঁজলেন, চশমাটা খুলে চোখটা মুছলেন, তারপর ভুরুদুটো কুঁচকে অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না!

চশমা খুললে অনেক লোকেরই মুখের চেহারাটা বদলে যায়। তখন স্বাভাবিক মুখটাই মনে হয় অস্বাভাবিক—চশমাটা যেন শরীরেরই অঙ্গ। আমি বসন্তদার পরিবর্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, কী ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না? আর কী চান বসন্তদা? কিছুই বুঝতে পারলাম না!

একজন বেকার ছেলে কিংবা কোন দুঃখী বিধবা নারী যদি এরকম বলে, তাহলে একটা মানে বোঝা যায়। কিন্তু বসন্তদা কিংবা কফি হাউসের সেই প্রাণোচ্ছল সুরূপা মেয়েটি কেন এরকম কথা বলে?

হতে পারে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, এটা একধরনের ভাববিলাস। কিন্তু কথাটা আজকাল বড্ড বেশি শুনি। কোথাও কোন তৃপ্তি নেই। কথাটা শোনার পরই আমি তীক্ষ্ণভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। কফি হাউসের সেই অচেনা মেয়েটি কিংবা বসন্তদার মুখে সেই মুহূর্তটায় কিন্তু আমি কোন ভাববিলাসের চিহ্ন দেখিনি, দেখেছি একটা অদ্ভুত রহস্যময় রেখা। সেই রেখাটার নামই ভালো-না-লাগা।

বেশ কিছুদিন আগে আমি রাঁচির কাছে নেতার হাটে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। নেতার হাটে আমি পরেও একবার গেছি, কিন্তু প্রথমবারের ভালো লাগার কোন তুলনা হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেই এক অপরূপ জায়গা। ডাকবাংলোর সামনের চত্বরটায় দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায়—বিশাল উপত্যকা—স্পষ্ট দেখা যায় পৃথিবীর কোন এক সীমানায় আকাশ এসে মিশে গেছে—ডানদিকের পাহাড়গুলোর মাথায় হাল্কা-হাল্কা মেঘ—এক-একটুকরো ছেলেবেলার স্বপ্নের মতন। রাত্রিবেলা দেখা যায়, দূরের জঙ্গলে কারা যেন আগুন জ্বালিয়েছে, কিংবা দাবাগ্নি,—বিরাট একটা মালার মতন আলো। মাইকেলের অনুকরণ করে বলা যায়, কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, বনানী! যাই হোক, প্রকৃতিবর্ণনা আমার হাতে একদম আসে না, পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নিন!

নেতার হাটের মতন জায়গায় হাসিখুশি মানুষরাই যায়। কিংবা মুখগোমড়া মানুষরা গিয়েও হাসিখুশি বইয়ের মলাট হয়ে পড়ে। নানারঙের শৌখিন পোশাক, ঝলমলে মুখ—এইসবই স্বাভাবিক দৃশ্য। নবদম্পতিদেরও দেখা যায় খুব।

রাঁচি থেকে একটা ভাড়া করা জিপে আরো কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করে

এসেছিলাম আমি। সেই জিপেই একটি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদেরও নববিবাহিত-যুগল মনে করে, নেতার হাটে পৌঁছে আমি তাদের এড়িয়ে চলতাম। নবদম্পতিদের নির্জনতার সুযোগ দেওয়া উচিত, তাদের পাশে-পাশে ঘুরে বকবক করার মতন মূর্খতা আর হয় না।

কিন্তু ওরা দুজনেই বারবার আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলতেন। শুধু আমার সঙ্গে নয়, প্রায় সবার সঙ্গেই। ভারী আলাপী ও মিশুক ওরা দুজনেই, তাছাড়া একেবারে নবদম্পতি নয়—দুবছর আগে বিয়ে হয়েছে। কী যেন নাম ছিল ওদের? হ্যাঁ, মনে আছে, সমীপেন্দ্র আর ভাস্বতী—ওদের নাম বা চেহারা একটুও ভুলিনি।

এমন প্রাণখোলা আর সহজ-সরল স্বামী-স্ত্রী আমি আগে কখনো দেখিনি—দুজনেই যেমন সুস্থ স্বাস্থ্যবান, তেমনি যে-কোন ঘটনা থেকেই ওরা একটা কিছু আনন্দ খুঁজে নিতে পারে। বেশ আলাপ হয়ে যাবার পর জানলাম, ওদের দুজনেরই খুব ঘুরে বেড়ানোর নেশা—দু-তিনমাস অন্তর-অন্তরই ওরা কোথাও বেড়াতে চলে আসে। কী যেন একটা পারিবারিক ব্যবসা আছে, ছুটিফুটির অসুবিধে হয় না।

ডাকবাংলোর চত্বরের আলসেতে বসে আছে সমীপেন্দ্র আর ভাস্বতী, আমি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। সামান্য-সামান্য শীত, ভারী মনোরম হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে একটুও মেঘ নেই তখন—অতদূর পর্যন্ত অতখানি আকাশ আগে কখনো দেখিনি—সেখানে যুঁই ফুলের মতন তারা ফুটে আছে—আর, এর চেয়ে বেশি আনন্দের—

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সমীপেন্দ্রর কী একটা যেন কথার উত্তরে ভাস্বতী বলল, দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না! আজও কানে ভেসে আসে সেই গলা। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এইরকম পরিবেশে, ভাস্বতীর মতন মেয়ের মুখে এরকম কথা শুনব, কল্পনাই করিনি। অন্ধকারে আমি ভাস্বতীর মুখ দেখতে পাইনি—কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, 'কিচ্ছু' শব্দটার ওপর সে বেশি জোর দিয়েছিল—আর কণ্ঠস্বর ঠিক কান্না মেশানো নয়, একধরনের অভিমান ও অতৃপ্তিতে ভরা। কী চায় ভাস্বতী? আর কোন ভালোলাগার জন্য তার এত অতৃপ্তি? কিন্তু সে 'কিচ্ছু' শব্দটার ওপর জোর দিয়েছিল।

ভাস্বতীর সঙ্গে আলাপ কখনো এতটা গাঢ় হয়নি যে তাকে এই ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। আমি তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম, পরদিন সকালেই ওরা নেতার হাট ত্যাগ করল। আর কখনো দেখা হয়নি। তবু, প্রায়ই, অন্ধকারে হাটুর ওপর থুতনি রেখে বলা ভাস্বতীর ঐ কথাটার রহস্য বহুদিন আমাকে ভাবিয়েছিল।

এখন তো এই কথাটা প্রত্যেক দিনই ট্রামে-বাসে, পথচলতি মানুষের মুখে শুনতে পাই—সার্থক, ব্যর্থ—কোন লোক বাদ নেই। এমনকী, একটা তিন বছরের বাচ্চার মুখ থেকে শুনলেও বোধ হয় আর অবাক হব না!

৭

এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছেন?

প্রতিদিন গড়ে অন্তত চারবার করে এই প্রশ্নটা শুনতে হয় এখন। এমনকী আমিও হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হলে, প্রথমে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলি, কি, পুজোয় কোথাও যাচ্ছেন নাকি? যদিও আমার কিছু যায় আসে না তাতে, অন্য কেউ কাশ্মীর বা কন্যাকুমারিকা, যেখানেই যাক, তাতে আমার কী?

আমি কোথাও যাচ্ছি না।

শোনা যাচ্ছে, এবার পুজোয় নাকি কলকাতায় বিশেষ কেউ থাকছেই না। এবার দলকে দল বাইরে পালাচ্ছে। পুরী, মধুপুর, দার্জিলিং, রাজগীর টাইপের জায়গাগুলো এবার কলকাতার বাঙালিতে ছেয়ে যাবে। কারণ, কলকাতায় টানা মাসের পর মাস ধরে যে খুন-জখম, বোমা-গুলি চলছে বোজ, এর কবলে যারা পড়েনি, তাদেরও এইসব খবর শুনে-শুনে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হবার মতন অবস্থা। পুজোর ক'টা দিন তাই তারা একটু শান্তিতে থাকতে চায়, প্রকৃতির সজলতার দিকে তাকিয়ে জুড়োতে চায় চোখ।

আমি কলকাতাতেই থাকব, কলকাতা যদি ফাঁকা হয়ে যায়, সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ ছাড়ব না। যখন যেখান থেকে খুশি ট্রামে-বাসে উঠতে পারব, এটা কী কম কথা নাকি? এমনকী পকেটে যদি টাকা থাকে, তাহলে হয়তো ট্যাকসি চাইলে ট্যাকসিও পেয়ে যেতে পারি। এসব অভিজ্ঞতা তো বহুদিন হয়নি।

ট্রাফিক জ্যামে বাসটা থেমে আছে, আমি হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলছি, হাত টনটন করছে, তবু হাত ছেড়ে পা মাটিতে রেখে বিশ্রাম করার ভরসা নেই, কারণ, বাসের হ্যাণ্ডেলে যে চার ইঞ্চি জায়গা আমার জন্যে বরাদ্দ, সেটা যদি ফস্কে যায়! সেই অবস্থায় তাকিয়ে দেখছি পাশের আলো-ঝলমল দোকানগুলোর দিকে।

একটা পোশাকের দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুটি মেয়ে। দুজনেরই হাতে অনেকগুলো শাড়ির প্যাকেট। খুশিতে টসটস করছে মুখ। শুধু শাড়ি কেনার জন্যই নয়, টাকা খরচ করতে পারলেই মেয়েদের মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফোটে। নিয়নের আলোয় তাদের মুখদুটি সত্যিই দিব্য।

দু-একটা টুকরো-টুকরো কথা শুনতে পেলাম। তোরা কার্সিয়াং যাচ্ছিস? কবে স্টার্ট করছিস? দার্জিলিং-এ আসবি নিশ্চয়ই!

আমরা জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ি যাচ্ছি—ওখান থেকে দার্জিলিং-এ আসব...তোদের ওখানকার ঠিকানা...

বাস ছেড়ে দিল। ঐ মেয়েদুটি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং যাবে। আমি কোথাও যাব না, কলকাতাতেই থাকব। তবে, এবার সত্যি কথাটা বলা যায়, আমি যে নিছক কলকাতার প্রেমেই কলকাতা থেকে যাচ্ছি, তা নয়। এবার আমার পকেট গড়ের মাঠ। এবার পুজোতে আমি গড়ের মাঠেই ঘুরব একা-একা। এবার আমার খুবই খারাপ দিন কাটবে। কারণ, বোমার আওয়াজের থেকেও পুজো প্যাণ্ডেলের বিকট হিন্দি গানের চিৎকার আমার অসহ্য লাগে।

তরুণীদুটির কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। দার্জিলিং মালে একদিন ঐ দুই তরুণীর আবার দেখা হবে। একজন আসবে কার্সিয়াং থেকে, আর-একজন জলপাইগুড়ি—রোমাঞ্চকর শীত, উজ্জ্বল লাল-হলদ রঙের গরম পোশাক...শৌখিন ঘোড়ায় চড়া—যে মেয়েটির রং খুব ফর্সা, তার একটা গোলাপী রঙের কোট আছে, যে-মেয়েটি একটু কালো, সে গায়ে জড়িয়েছে একটা কাজ করা শাদা শাল—কী একটা কথায় যেন ওরা হাসছে, আমি একটা দোকানের দরজার পাশ দিয়ে ওদের দেখছি।

আমি? হ্যাঁ, আমিই তো আমার টুইডের কোটটা গায়ে দিয়ে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চালিয়াৎ ছোকরার মতন দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েদুটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাসলাম। ওরা অবাক হলো, ওরা চোখ নিচু করল, পরস্পরের দিকে তাকাল, নীরব প্রশ্নের পর আবার দেখল আমার দিকে।

এবার আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী চিনতে পারছেন?

—না তো!

—চিনতে পারছেন না? উই মেট বিফোর?

ফর্সা মেয়েটি এবার মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কাকে বলছেন বলুন তো?

আমি হেসে বললাম, আপনাদের দজনের সঙ্গেই আমার আগে দেখা হয়েছে। অবশ্য, আপনাদের সেটা মনে থাকবার কথা নয়। আমি একটা বাসের পা-দানি থেকে দেখেছিলাম আপনাদের। ভবানীপুরের কাছে আপনারা একটা শাড়ির দোকান থেকে বেরুচ্ছিলেন—

এরপর কী আলাপ জমবে না? পাচ মিনিট বাদে কী বলা যাবে না, চলুন, কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক?

কে এসব কথা বলছে ? আমি ? নাকি, কোন সিনেমায় এরকম দৃশ্য দেখেছি ? না, কোন সিনেমায় নয়, সিনেমা হলে দুটো মেয়ের বদলে একটা মেয়ে থাকত। তবে, বলাই বাহুল্য, হঠাৎ ওভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমানো আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু মনে-মনে কথা বলায় কে আটকাচ্ছে ? আহা, পুজোর মধ্যে ঐ মেয়েদুটি যখন আবার দার্জিলিং-এ মিলিত হবে,তখন ওরা জানতেও পারবে না, একটি অনুপস্থিত আত্মা দূর থেকে লক্ষ করছে ওদের। ওদের সঙ্গে কথাও বলছে। কোন অসাফল্য নেই।

এই খেলাটায় আমি মেতে উঠলাম। পরদিন বাসের দোতলায় তিনটি ছেলে তুমুল আলোচনা করছিল, ওরা এবার পুজোয় পায়ে হেটে সারা ত্রিপুরা ঘুরে বেড়াবে। আগরতলা পর্যন্ত যাবে প্লেনে, তারপর পায়ে হেটে—। আমিও ওদের সঙ্গী হয়ে পড়লাম মনে-মনে।

দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে গেলে, তিনজনের বদলে চারজনে যাওয়াই সুবিধেজনক। তাস খেলার পার্টনারের অভাব হয় না। বিছানা বা জিনিসপত্র ভাগাভাগি করার সুবিধে হয়। কোথাও সাইকেল-রিকশা ভাড়া করতে গেলে—তিনজনে এক রিকশায় চাপতে পারবে না, দুটো রিকশা নিলে একজনের ভাড়া বেশি পড়ে যাবে।

এবার পুজোয় আমি ওদের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিপুরায় ঘুরব। ওদের সঙ্গে পাশাপাশি শোব এক বিছানায়, সিগারেট ভাগাভাগি করে খাব। ওরা যখন ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির কিংবা উদয় সাগর দেখতে যাবে, তখন আমিও ওদের সঙ্গী। ওরা জানতেও পারবে না—অশরীরী একজন ওদের সঙ্গে চতুর্থ হয়ে ঘুরছে।

রত্নামাসিরা যাচ্ছেন গোপালপুর-অন-সী। রত্নামাসি বললেন, তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে, চল না ? আমরা তো অনেকে মিলে যাচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না।

আমি বললাম, ওরে বাবা, না, না, আমি যেতে পারব না ! কলকাতায় আমার অনেক কাজ !

রত্নামাসি বললেন, এমনিই তো কত কাজ করে উল্টে দিচ্ছিস ! পুজোর মধ্যে আবার কাজ কী রে ?

—দারুণ জরুরি কাজ আছে আমার !

দূর সম্পর্কের মাসি বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে হুট করে রাজি হয়ে যেতে নেই। তাতে প্রেস্টিজ থাকে না। কিন্তু আমার গোপালপুর যাওয়ায় কেউ বাধা দিতে পারবে না।

বেহরামপুরে রত্নামাসিরা যখন গোপালপুরের বাসে উঠবেন, তখন আমিও কী বাসের জানলার ধারে একটা সীটে বসে নেই ? কল্পনায় ভ্রমণের সুবিধে এই,

তাতে ঠিক জানলার ধারের সীটটা পাওয়া যায়—বাস্তবে বরং অনেক সময় জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। আমি সাঁতার জানি, ওখানকার সমুদ্রে সাঁতার কাটব সারাদিন। রত্নামাসির ছোট ছেলে রঞ্জুকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়ে ক্রেডিট নেব। আর কেউ যদি দৈবাৎ বেশি জলে চলে গিয়ে হাবুডুবু খায়—তাকে উদ্ধার করে আমি সিনেমার হীরোর মতন...। দেব নাকি সেরকম একটা সিচুয়েশন? সন্ধেবেলায় বালুকাবেলায় বসে দেখব দূরে অন্ধকারে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের খেলা—কাছেই কে যেন রিনরিনে গলায় গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীত—।

এবার পুজোয় আমি কোথাও যাব না, আমি অনেক জায়গায় যাব।

এবার পুজোয় আমার মতন যাদের পকেট গড়ের মাঠ, তারা আমার মতন এই খেলাটা খেলে দেখুন-না!

৮

সব চেয়ে স্বাভাবিক ছিল কী, জলপাইগুড়ির সর্বনাশা বন্যার সময় যেমন কলকাতার পথে পথে মিছিল বেরিয়েছে, দেশের অন্য অঞ্চলের অগণিত মানুষ যথাসাধ্য টাকা পয়সা, চাল ডাল, কাপড় চোপড়, কম্বল দিয়ে সাহায্য করেছে, দলে-দলে যুবকেরা গেছে জলপাইগুড়িতে ত্রাণকার্যে—তেমনি এবারেও ঢাকা-বরিশাল-ভোলার ভয়ংকর বন্যার পরও এখানকার মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কলকাতার পথে-পথে আবার বেরুবে আবেদনময় মিছিল, যথাসম্ভব সাহায্য নিয়ে এখানকার ছেলেরা চলে যাবে সীমান্তের ওপারে, এখানকার সাংবাদিকরা ওখানে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখবে। এখন কিছুদিনের জন্য আর-সব কোলাহল, দাপাদাপি বন্ধ থাকবে। কেননা, আমাদেরই ঘরের পাশে তেইশ লক্ষ মানুষ আজ বিপন্ন, মৃতের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। কথাটার ওপর জোর দেবার জন্য আমি আবার বলছি, তেইশ লক্ষ মানুষ আজ বিপন্ন। একই ভাষা, একই সংস্কৃতির খুব চেনাশুনো মানুষ।

কিন্তু যা স্বাভাবিক, তা আর এখন হয় না। আমাদের নেতৃস্থানীয় কারুর মনে এই বন্যার জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে—এরকম চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। দিল্লিতে অবশ্য কিছু মামুলি ঠোঁটবার্তা দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখন রাশি-রাশি সাহায্য উড়ে আসবে, বর্বর শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি থেকে দলে-দলে ছেলেমেয়ে প্রাণ বিপন্ন করে ওদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে। শুধু বাঙালির বিপদে বাঙালি যাবে না। এবং এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনার পরও সীমান্তের

দরজা খুলবে না। কিংবা তাও ঠিক বলা যায় না, এখানকার ছেলেরা যদি সাহায্য নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিত, তাহলেও সীমান্তে তাদের আটকানো হতো কিনা আমি জানি না। বন্যা তো সীমান্ত মানে না—বন্যায় ভেসে আসা পাকিস্তানী জেলেরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়—যেমন জলপাইগুড়ি থেকে অসংখ্য মৃতদেহ পাকিস্তানে ভেসে গিয়েছিল।

ভিয়েৎনামের নিপীড়িত কিন্তু অদম্য সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে সমর্থন ও সহানুভূতি জানানো যেমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি প্রতিবেশীর এই বিরাট প্রাকৃতিক বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াও একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাস ছাড়া আর কোন বিশ্বাসেরই দাম নেই, এটা আমি বুঝতে পারি না। মাসখানেক আগেও আমি নিজেকে বেশ আধুনিক মনে করতাম। এখন আর আধুনিক নই। মানবতাবোধ যদি একটা নিছক প্রাচীন সংস্কার হয়, তাহলে আমিও প্রাচীনপন্থী।

জলপাইগুড়ির সাংঘাতিক বন্যা যখন হয়, তখন আমি দিল্লি ছিলাম। ওখানে বসেই খবরের কাগজে প্রথম খবরটা দেখি। বলাই বাহুল্য, কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতেই সেই সংবাদ বিস্তৃতভাবে বেরিয়েছিল, দিল্লির বা সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে এ ঘটনার স্থান ছিল যৎসামান্য। দিল্লির প্রবাসী বাঙালিরা এ খবরে দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন, অনেকে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির অবাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। কেউ-কেউ অবশ্য জিব দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করেছেন। পেরু বা টার্কির ভূমিকম্পের সংবাদ শুনলে যেমনটা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের এই বিপর্যয়, কারুরই নিজের ব্যাপার নয়—প্রায় যেন বিদেশের ঘটনা। তবে, কলকাতার খুনোখুনির খবর কিংবা শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় অনেকে বিচলিত হয়—কারণ, এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ব্যবসায়িক প্রশ্ন জড়িত। রাজনীতি কিংবা ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই। বিলেতের আচার ব্যবহার বা সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের আচার ব্যবহার-সংস্কৃতির যতটা তফাৎ—দিল্লির সঙ্গেও প্রায় ততটাই।

কিন্তু বাংলাদেশের এক খণ্ডের জন্য বাংলাদেশের আর-একখণ্ডের সাধারণ মানুষের মনের ভাব একরকম হতেই পারে না। পশ্চিম বাংলার অন্তত অর্ধেক মানুষের মনে এখনো পূর্ব বাংলার স্মৃতি জাগরূক। রাজনীতির ছুরি এখনো হৃদয়ের সেই অংশটা কেটে বাদ দিতে পারেনি। এবার কয়েকটা ছোট-ছোট ঘটনা বলি।

সকালবেলা বাজারে গিয়েছিলাম। এবার পুজোর আগে হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগণায় যে বন্যা হয়ে গেল তার জন্য তরকারির বাজারে এখন দারুণ টান।

জিনিসপত্রের এত দাম বাড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেই দোকানীরা বন্যার কথা বলত খেদের সঙ্গে। আজ দেখলাম অন্যধরনের ছবি।

তরকারির দোকানে খবরের কাগজ থাকাটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সকালবেলার দিকে বেশ ভিড়, দোকানদারদের কাগজ পড়ার সময় কোথায়? কিন্তু আজ আমার চেনা তরকারির দোকানে একটা খবরের কাগজ ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে চার-পাঁচজন। একজন গলা চড়িয়ে বলল, এই দেখেছিস, তোদের বরিশালে কী অবস্থা!

সঙ্গে-সঙ্গে লাউকুমড়োর দোকানের দোকানী তার দোকান ছেড়ে উঠে এসে বলল, কই দেখি, দেখি! বরিশালের কোন-কোন থানা? আবে সর্বনাশ! পটুয়াখালিতে যে আমাগো মামাবাড়ি ছিল! সব ভেসে গেছে!

একজন জিজ্ঞেস করল, তোর মামাবাড়িতে কেউ আছে এখনো?

সে বিষণ্ণভাবে বলল, না! কেউ নাই!

একজন বলল, আমাগো ফরিদপুরে বিশেষ কিছু হয় নাই বোধ হয়। কাগজে তো ল্যাখে নাই।

লাউ-কুমড়োওয়ালা তখন মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছে। আমি বাজারের থলি হাতে চুপচাপ দাড়িয়ে আছি। অন্য দু'-চারজন খদ্দের বিরক্তি প্রকাশ করছে বা চলে যাচ্ছে অন্য দোকানে। সে হঠাৎ আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, এই তো, কলাবাড়ি! কলাবাড়িতে আমাগো নিজের বাড়ি! হায় হায়, হায়, সব গ্যাছে! একজনও নাকি বাইচ্যা নাই! কলাবাড়ি, গোপপাড়া, ভোলা—এইসব জায়গা আমি ক-তবার—

—তোদের বাড়ি এখনো ছিল ওখানে?

—না।

—আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?

—না।

—তাহলে ওরকম করিস কেন?

—ওখানকার কত মানুষরে চেনতাম।

সে ফিরে এল নিজের দোকানে। মুখখানি ম্লান, বিবর্ণ। আমি তার কাছে গিয়ে জিনিস কেনার জন্য দাড়াতেই সে বলল, বাবু, আমাদের দ্যাশের সর্বনাশ হয়ে গেছে! বন্যায় একেবারে—

যে দেশ সে ছেড়ে এসেছে, সেটাকেও সে এখনো বলছে, আমাদের দেশ। যেখানে তার কোন ঘরবাড়ি নেই, আত্মীয় নেই—সেখানকার বন্যার জন্যও সে বুকে এখনো শেল অনুভব করে।

দুপুরে ট্রামে যাচ্ছিলাম। সামনের সীটের দুজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাবার্তা কানে এল। দুজনেরই বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল খুব বেশি পাকেনি, ধুতি পাঞ্জাবি পরা।

একজন প্রৌঢ় বললেন, উনিশশো তেত্রিশ ঈস্টবেঙ্গলে একবার এইরকম বন্যা হয়েছিল। এতটা বেশি নয়—কিন্তু আমরা খুব সাফার করেছিলাম। আমি তখন বরিশালের বি এম কলেজে পড়ি—

দ্বিতীয় প্রৌঢ় বললেন, ও, আপনি তখন বরিশালে ছিলেন নাকি? আমিও ছিলাম তো। আমার বাড়ি যদিও বাঁকুড়ায়—কিন্তু আমি তখন পোস্টঅফিসের চাকরিতে সদ্য ঢুকিছি, ট্রান্সফার করল বরিশালে—অজানা অচেনা জায়গা—কিন্তু মাসতিনেকের মধ্যেই মানিয়ে নিয়েছিলাম—

—সেই বন্যার কথা আপনার মনে আছে?

—ওরেব্বাবা, মনে নেই আবার! তিনদিন ধরে বাড়ির চালে বসে থাকা, তারপর রিলিফ এল যখন—কলকাতা থেকে আমার দাদাও গিয়েছিলেন আমায় আনতে—

—আমাদের কলেজেও হাজার-হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা তখন ছাত্র তো, খুব উৎসাহের সঙ্গে রিলিফ পার্টিতে, ওঃ সে কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা—জলে ভেসে-ভেসে মড়া আসছে!

—সেবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকেও ছাত্রদের একটা বিরাট দল ভলান্টিয়ার হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় তখন একটা রাজনৈতিক সম্মেলন হবার কথা। সব বন্ধ রেখে সবাই তখন রিলিফের কাজে—এমনকী বড়বড় নেতারাও।

আমার স্টপ এসে গেছে, আমি নেমে পড়লাম। এইসব সাধারণ মানুষের কথা আর আজকাল বড় কানে পৌঁছোয় না। কোনো দেশের রাজনৈতিক মতামতও আজকাল সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে না।

৯

আমাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলের অসুখ, তার জন্য রোজ ছাগলের দুধ নেওয়া হয়। একজন সুঠাম চেহারার বিহারী রমণী প্রত্যেক দিন ভোরবেলা এসে বাড়ির সামনে ছাগলের দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়। ঘুম থেকে আমি যখন বারান্দায় খবরের কাগজের জন্য হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন ঐ দৃশ্যটি আমি দেখি।

ফুল-ফুল-ছাপ রঙিন শাড়ি-পরা রমণীটির বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, গলার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় বেশ দজ্জাল। বিহারের কোন সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতার মতন গোলমেলে শহরে ব্যবসা করতে এসেছে বটে, কিন্তু সহজে কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। তার ব্যবসার ধরনটিও প্রিমিটিভ। সের বা কিলোর ধার ধারে না—সোনার মতন চকচকে একটা ছোট্ট পেতলের ঘটি আছে, সেইটা তার পউয়া, সেটা ভর্তি করে দুধ দেবে—দাম বারো আনা, নেবে তো নাও, না নেবে না নেবে! তার ছাগলীটির চেহারাও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। বোঝা যায়, ঐ পেতলের ঘটি ও ছাগলটির প্রতি ওর বেশ যত্ন আছে।

ক'দিন ধরে দেখছি, ছাগলীটির সঙ্গে তিনটে বাচ্চাও আসছে। গরুর দুধ দুইবার সময় একটা বাছুর বা বাছুরের কঙ্কাল সঙ্গে রাখতে হয়—ছাগলের বেলায় তার দরকার হয় না। ছাগলছানাগুলো এমনিই বেড়াতে আসে। স্ত্রীলোকটি যখন চা চো চা চো শব্দে দুধ দোয়—ছানাগুলো তখন মনের সুখে লাফিয়ে বেড়ায়। ছাগলছানাগুলোর বেশ কচি-কচি ফুরফুরে ভাব, তিড়িং-বিড়িং করে যখন লাফায়—তখন দেখতে ভারী ভালো লাগে। তখন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করে না যে এমন সুন্দর একটা প্রাণী বড় হওয়া মাত্রই আমরা কেটেকুটে খেয়ে ফেলি।

যাই হোক, রোজ ঐ দৃশ্য দেখতে-দেখতে হঠাৎ এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করলাম যে, পৃথিবীতে কোন জিনিসই প্রত্যেকদিন একরকমভাবে চলে না।

আজ সকালবেলা, খবরের কাগজওয়ালার এখনো পাত্তা নেই—আমি দাঁড়িয়ে ছাগলের দুধ দোওয়া দেখছি, হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। দুধ দোওয়া হয়ে গেছে, স্ত্রীলোকটি পয়সার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ছাগলটি দুপায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমতন জোরে তার মালিকানীকে এক ঢু মারল। কোনদিন সেরকম বিদ্রোহ করে না। আজও দুধ দুইবার সময় রীতিমতন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল, হঠাৎ এখন তার কেন এইরকম ইচ্ছে হলো কে জানে!

আচমকা ঢু খেয়ে স্ত্রীলোকটি হাউমাউ চিৎকার করে দৌড়ে গেল সামনের দিকে, সে ভেবেছিল অন্যকিছু। দৃশ্যটা এমনই মজার যে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে ফেললাম। রাস্তার লোকরাও পথ চলতে-চলতে হেসে দাঁড়িয়ে গেল। ছাগলের গুঁতো মারার মধ্যে একটা হাস্যকর ব্যাপার আছেই। স্ত্রীলোকটি প্রথমটায় অপ্রস্তুত হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ছাগলীটার দিকে ফিরে চেঁচে হিন্দিতে খুব একচোট গালাগালি দিলে। তারপর তাকে যেই ধরতে গেছে, সে আবার দু'পা তুলে ঢুঁ মারার জন্য তৈরি হয়েছে। ছাগলীটার এইরকম মতিভ্রম দেখে সবাই হাসছে।

কিন্তু আগে বলেছি, রমণীটি যথেষ্ট তেজি। সে ওতে ঘাবড়াল না—খুব একচোট ধমক দিয়ে সে খপ করে ছাগলীর শিংদুটো চেপে ধরল। তখন ঘটল আর-একটা মজার ব্যাপার। ছাগলছানা তিনটে এতক্ষণ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, এখন তারা মায়ের অনুকরণে কিংবা মায়ের অপমান সহ্য করতে না-পেরে, তারাও কচি-কচি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঢুঁসোতে লাগল স্ত্রীলোকটিকে। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে তখন সেখানে জড়ো হয়ে সানন্দে হাততালি দিচ্ছে। অনেক বাড়ির জানলা খুলে গেছে, অনেক বারান্দায় নারী-পুরুষ দেখছে মজা।

স্ত্রীলোকটি ছাগলটাকে ছেড়ে ছানাগুলোকে সামলাতে যেতেই সবাই মিলে দিল পো পো ছুট। তারপর শুরু হলো এক লুকোচুরি খেলা। ছাগলী কিংবা ছাগলছানা একবার দৌড়োলে তাদের ধরা সহজ নয়। আমাদের পাড়ার রাস্তায় ছাগলীটা তার বাচ্চাদের নিয়ে মালিকানীর হাত এড়িয়ে দৌড়োতে লাগল এদিক-ওদিক। স্ত্রীলোকটিও শাড়িটা গাছকোমর করে বেঁধে চোখ পাকিয়ে তাড়া করছে ওদের। মা-টাকে ধরতে যায় তো বাচ্চাগুলো সটকে পালিয়ে যায়—আবার বাচ্চাগুলোকে ধরতে এলে মা কাছে এগিয়ে এসে লোভ দেখায়। হাসতে-হাসতে আমাদের দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা।

না, বিদ্রোহ নয় সত্যি-সত্যি। স্ত্রীলোকটি শেষ পর্যন্ত বড় ছাগলীটার গলার দড়ি ধরে ফেলল, বাচ্চাগুলোও তখন সুড়সুড় করে চলে এল কাছে। স্ত্রীলোকটি ছাগলীটার মাথায় কৃত্রিম কোপে একটা চাপড় মারল, সে আর মাথা তুলল না, মাথা নিচু করে গেল। এ যেন মায়ের সঙ্গে ছেলেদের দুষ্টুমি। ছাগলগুলো অনাদিন একরকম থাকে, আজ তাদের একটু খেলা করার ইচ্ছে হয়েছিল শুধু। স্ত্রীলোকটি তার দলবল নিয়ে চলে গেল, মিনিট দশেক আমরা নির্মল আনন্দ পেলাম!

আজ সকালেরই আর-একটা ঘটনা। বাজার থেকে বেরিয়ে রিকশা নিতে গিয়ে দেখি রিকশাওয়ালার চোখে একটা সানগ্লাস। এ পর্যন্ত আমি চশমা পরা রিকশাওয়ালাই কখনো দেখিনি, তার ওপর গগলস-পরা রিকশাওয়ালার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। তাও যা-তা গগলস নয়, রীতিমতন দামি সানগ্লাস—আজকাল শৌখিন মেয়েরা যেরকম পরে।

রিকশাওয়ালাটির বয়েস তেইশ-চব্বিশ বছর হবে, রীতিমতন জোয়ান পুরুষ। মুখে একটা ভারী কমনীয় লজ্জা-লজ্জা ভাব। ওর পোশাক, যেরকমটি হয়, অত্যন্ত ময়লা এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়ানো—এবং গেঞ্জিটা এতরকমভাবে ছেঁড়া যে সেটা একবার খুলে আবার পরতে গেলে রীতিমতন ম্যাজিকের দরকার হয়। সেই সঙ্গে একটা দামি সানগ্লাস—ভাবুন একবার দৃশ্যটা!

অন্যান্য রিকশাওয়ালা ওকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে। সব কথা আমি ঠিক

বুঝতে পারছি না। তবে অনুমান করছি, বাসরঘরে বরকে নিয়ে যেমন অনেকে ক্ষ্যাপায়, ওর অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। ও অবশ্য খুব একটা গ্রাভিটি নেবার চেষ্টা করছে। কালো চশমা-পরা ফিল্মস্টার যেমন আশেপাশে ভক্তদের চেঁচামেচিতেও ভ্রূক্ষেপ করে না, রিকশাওয়ালাটিও তেমনি কারুর কথার উত্তর দিচ্ছে না, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না, লাজুক মুখটাকে গম্ভীর করে রাখতে চাইছে।

রিকশা ঠুনঠুন করে ও আমার কাছে এসে বলল, চলিয়ে বাবু! আমি উঠে বসতেই ও জোরে ছুটতে লাগল। অন্যদিনের চেয়ে বেশি জোরে। ও আমার অনেক দিনের চেনা—আমাকে দেখলেই এগিয়ে আসে—অনেক সময় আমার রিকশায় ওঠার দরকার না-থাকলেও জোরাজুরি করে। সরলভাবে বলে, আপনারা রিকশায় না-উঠলে আমরা খাব কী? ভিখ মাংব?

ওর রিকশায় উঠেই আমি বুঝতে পারলাম, আমি রীতিমতন একটা দর্শনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। পথচলতি অন্য রিকশাওয়ালারা ওর দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছে, অনেকে রাস্তার ওপার থেকে এপারে চলে এসে মুখ নেড়ে বলছে, বাবু বনগইলি? রাস্তার লোকও অবাক হয়ে দেখছে ওকে। ও কিন্তু নির্বিকার।

ভারতের কিছু-কিছু গ্রামে আমি ঘুরেছি। দেখেছি যে সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষের ধারণা চশমা জিনিসটা বাবুদের পোশাকের অঙ্গ। বাবু না-হলে কেউ চশমা পরে না। গরীব লোকদেরও নিশ্চয়ই চোখ খারাপ হয়, এবং কোনক্রমে কেনার ক্ষমতা থাকলেও, ওটা তাদের মানায় না। আর সানগ্লাস!

কিন্তু আজ আমার মনে হলো, রিকশাওয়ালাদেরই তো সানগ্লাস পরার কথা। এটাই তো সব চেয়ে স্বাভাবিক। যারা দুপুর রোদে টো-টো করে পায়ে হেঁটে ঘুরছে, তারা সানগ্লাস পরবে না তো কে পরবে? হাতে টানা রিকশা উঠে যাওয়া উচিত। এর মধ্যে একটা গ্লানি আছে। কিন্তু কলকাতা শহর থেকে রিকশা যখন তুলে দেওয়া যাচ্ছে না, কিংবা যতদিন-না তুলে দেওয়া হয়—ততদিন রিকশাওয়ালাদের জন্য কেডস জুতো আর সানগ্লাসের ব্যবস্থা তো করা যেত অন্তত!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শিউপূজন, ইয়ে কাঁহা সে মিলা হ্যায়?

শিউপূজন গম্ভীরভাবে বলল, চশমা হ্যু একঠো দিদিমণি দিয়া।

—একঠো দিদিমণি এমনি-এমনি একটা এত ভালো চশমা দিয়ে দিল?

—দিদিমণির হাত নিকালকে পড়ে গেল! একটা ডাণ্ডা টুটে গেল। দিমাগ খারাপ হয়ে গেল উনকা—ফেক দিতে যাচ্ছিল, হামি নিয়ে নিলাম!

খুলে দেখাল যে সত্যিই একটা ডাঁটি ভাঙা, সেটাকে ও ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আমি বললাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে তোমায়!

নেমে পড়ার পর পয়সা দিতে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই চশমা পরলে কেমন লাগে?

একমুখ হেসে তরুণ রিকশাওয়ালাটি বলল, ঠাণ্ডা! দুনিয়া বিলকুল ঠাণ্ডা!

এইসময় আর-একটি তরুণ রিকশাওয়ালা কাছে এসে দাঁড়াল। সে বোধহয় ওর বন্ধুটন্ধু হবে। সে বলল, দে তো, আমি একবার পরি! তারপর সে চোখে দিল সানগ্লাসটা, সেও বলল, আঃ, কেয়া ঠাণ্ডা রে! দুজনে শিশুর মতন আনন্দে হাসতে লাগল। এই মুহূর্তে ওদের কোন অভাববোধ নেই।

আজ সকালের এই দুটি ঘটনায় আমার মনে হলো, কলকাতা শহরে এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, গণ্ডগোল—কিন্তু তবুও ছোটখাটো মজার ব্যাপারগুলো এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও মানুষ এখনো আনন্দের উৎস খুঁজে নিতে পারে।

১০

দাদাশ্রেণীর একজন চেনা লোকের কাছে দশটা টাকা ধার চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি টাকাটা দিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু মোলায়েম উপদেশও শুনিয়ে দিলেন। ধার চাইতে গেলে ওরকম একটুআধটু শুনতেই হয়, আমিও শুনে গেলাম গদগদভাবে, কিন্তু মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, বুঝলে, একটু হিসেব করে চলতে হয়, নইলে টাকাপয়সার অভাব কোনদিন ঘোচে না। দেখছো তো আমাকে, টু দি পাই পর্যন্ত হিসেব করে চলি—তাবলে কৃপণতা করার প্রয়োজন নেই, যখন যেটা দরকার, কিন্তু হিসেবটাই হলো আসল। হিসেব থাকলে—

চাইতে গেছি মাত্র দশটা টাকা, এর মধ্যে এত কথা আসে কোথা থেকে? হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা হলে না হয়—তাও অবশ্য আমি হিসেব রাখতে পারতাম না—কেননা আমি অঙ্কে এতই কাচা যে পায়ের জুতো না-খুলে কুড়ি পর্যন্তও গুনতে পারি না। (এই রসিকতাটা আমি ঐ দাদার সামনেই একদিন বলেছিলাম, উনি বুঝতে পারেননি। ভাবলেন, ওকে আমি অপমান করার চেষ্টা করছি। কী বিপদ!)

যাই হোক, হিসেবের কথাটা আমার খুব মনে লেগে গেল। দশটা টাকা খরচ হয়ে যাবার পর মনে পড়ল, এবার একটা হিসেব করা যাক। টাকা পয়সার হিসেব আমার কাছে নিছক বিড়ম্বনা মাত্র, তবে জীবনে এ পর্যন্ত কী-কী হারিয়েছি, তার একটা হিসেব নিলে মন্দ হয় না।

প্রত্যেকেই জীবনে অনেক কিছু হারায়। কিন্তু সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে প্রথমটায় কিছুই মনে পড়ে না। আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু একসময় বলেছিল, সে তার জীবনে যতকিছু হারিয়েছে, তার মধ্যে একটা চন্দন কাঠের বোতামের কথাই তার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় পপলিনের শার্টে যে চন্দন কাঠের বোতাম লাগিয়ে পরত—সেই বোতাম হারানোর দুঃখ সে আজও ভুলতে পারে না। এখন সে ইচ্ছে করলে ডজন-ডজন চন্দন কাঠের বোতাম কিনতে পারে, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হারানোর দুঃখ আর যাবে না। আমার কাছে অবশ্য ব্যাপারটা খব গুরুত্বপর্ণ মনে হয় না, একটু যেন কবিতা-কবিতা মনে হয়।

আমি কী কী হারিয়েছি, তাই ভাবতে বসি। প্রথমেই মনে পড়ে, সময়। অনেক সময় যে হারিয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতের কথা জানি না, ভবিষ্যতে কী রকম সময় আসবে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, কিন্তু অতীতে যে অনেক সময় চলে গেছে তা তো নিশ্চিত। ইস্কুল কলেজের দিনগুলো তো একেবারে নষ্টই করেছি বলা যায়। আর একটু মন দিয়ে যদি পড়াশুনা করতাম, তাহলে কী আজ আমার এই অবস্থা হতো! আমাকে অনেকেই মূর্খ বলে। কিন্তু আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, আমার মূর্খতা বেশি পড়াশুনো করার জন্য নয়, পড়াশুনো না-করার জন্য!

আর কী হারিয়েছি? ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমে পড়া স্বভাব। তিন-চারটি মেয়েকে দারুণ ভালোবাসতাম নানা বয়সে। তাদের কারুকেই পাইনি বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভালোবাসা হারায় না, ভালোবাসা জমা থাকে। আমার বুকের মধ্যে তাদের কিছুই তো হারায়নি।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটা খাতা হারাবার কথা মনে পড়ে। সাধারণ একটা চার নম্বরের বাধানো খাতা, মলাটের রং ছিল লাল। খাতাটার বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, সেটাতে আমি জ্যামিতি লিখতাম, অনেকগুলো 'একস্ট্রা' করা ছিল। স্কুলে পড়ার সময় এরকম অনেক খাতাই অনেকের হারিয়ে যায়। আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে, তার নাম সুনন্দা, খাতাটা চেয়ে নিয়েছিল, বলেছিল, তোমার খাতাটা একটু দাও তো, 'একস্ট্রা'গুলো আমি লিখে নেব।' খাতাটা যখন ফেরত দিল শেষ পাতায় সবজ কালি দিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা আছে কয়েকটি কবিতার লাইন :

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে!

ঐ লেখাটা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। সবুজ কালিতে মেয়েলি হাতের লেখা ঐ লাইনগুলো চুম্বকের মতন আমায় টানল, কতবার যে পড়লাম তার ইয়ত্তা নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু এঁচোড়ে পাকা, অনেক গল্প-উপন্যাস-কবিতা লুকিয়ে পড়েছি, কিন্তু ঐ লাইনগুলো যে রবীন্দ্রনাথের তা ধরতে পারিনি। আমার ধারণা হয়েছিল, ওটা সুনন্দারই রচনা এবং আমারই উদ্দেশ্যে।

সুনন্দা ছিল পাড়ার মধ্যে খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে। অর্থাৎ বড়দের ভাষায় 'রহস্যময়ী'। কখনো সে খুব গম্ভীর, কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলত না, আবার কখনো খুব হাসিখুশি। মাঝে-মাঝে ওদের বাড়ির উঠোনে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতাম। বড়রা অবশ্য আমাদের তখন নেহাত ছোট মনে করত, আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে অনেক সময়ই বড়দের মতন আলোচনা করতাম। সুনন্দার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই, কেউ যদি কোন মিথ্যে কথা বা অসভ্য কথা বলত, অমনি সুনন্দার মুখখানা সত্যিকারের রাগে কাচকে যেত, ঝাঝালোভাবে বলত, 'এই, তাহলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

সেই সুনন্দা আমার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছে? ইস্কুলের ছেলের পক্ষে ঐ লাইনগুলো বেশ শক্ত, তবু আমি ওর থেকে অনেকরকম মানে আবিষ্কার করলাম। এবং ওর নিচে লিখলাম—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্র মাঝে আমি হব নাকো পথহারা

আমার কবিতা বানাবার ক্ষমতা নেই, তবে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, সুনন্দা কিছুতেই বুঝতে পারবে না, এ দুটো রবীন্দ্রনাথের লাইন। তারপর একদিন সুনন্দাকে ডেকে বললাম, আমার খাতায় আরো কিছু 'এক্স্ট্রা' কবেছি, তুমি নেবে? খাতাটা দেবার সময় কেন জানি না আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। সুনন্দা কিন্তু খাতাটা নিয়ে নিল অম্লানবদনে এবং দুদিন বাদে আবার ফেরত দিল নির্বিকারভাবে। একটি কথাও হলো না। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি, আমার লেখার তলায় আবার লেখা—

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল
তিয়াস আসি অন্তরে মম?

আজও মনে আছে, নিভৃত ঘরে সেই খাতা খুলে হৃদয় কী রকম উদ্বেলিত হয়েছিল। আমার এবং সুনন্দার লেখা লাইনগুলোর মধ্যে খুব যে একটা সামঞ্জস্য ছিল, তা বলা যায় না; কবিতার রোমাঞ্চকর মাদকতাই আমাদের অভিভূত করেছিল। আমি আবার কয়েক লাইন লিখে সুনন্দাকে খাতাটা ফেরত পাঠালাম।

এইভাবে শুরু হলো এক কিশোর ও কিশোরীর খেলা, মাঝখানে সেতু রইলেন রবীন্দ্রনাথ। কোনদিন কিন্তু আমরা সামনাসামনি এ সম্পর্কে একটা কথাও বলিনি। বড়রা কেউ আমাদের খাতাটা দেখে ফেললে কিছুই বুঝতে পারত না। বড়রা তো আর কবিতা পড়ে না!

কথা নেই বার্তা নেই সুনন্দা হঠাৎ চলে গেল এলাহাবাদে ওর মামার বাড়িতে। যাওয়ার আগে খাতাটা দিয়ে গেল না। হয়তো সুনন্দা খাতাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, হয়তো ওর তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু শুনলাম, এলাহাবাদে গিয়ে সুনন্দার দারুণ কঠিন টাইফয়েড হয়েছে। দারুণ উৎকণ্ঠা আর বিষাদের মধ্যে কাটল আমার কয়েকটা দিন।

ঘটনাটা ঠিক বিয়োগান্ত নয়। সুনন্দা সেরে উঠেছিল। কিন্তু এলাহাবাদে অনেকদিন রয়ে গেল, ফিরল প্রায় এক বছর বাদে। সেই বয়েসটাতে, এক বছরে অনেককিছুই বদলে যায়। তখন আমি অন্য ক্লাসে উঠে গেছি, জ্যামিতির খাতাটা ফেরত চাওয়ার কোন মানে হয় না। সেই প্রসঙ্গে আর কোনদিন উচ্চবাচ্য করিনি সুনন্দার কাছে।

হারিয়ে গিয়েছিল বলেই সেই লাল খাতাটার কথা এখনো আমার মনে আছে। এখনো সবুজ কালিতে সুনন্দার গোটা-গোটা হাতের লেখা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জীবনে অনেক কবিতা ভুলে গেছি, ঐ কবিতার লাইনগুলো ভুলিনি। খাতাটা যদি আমার কাছেই থাকত, এতদিন কী আর সেটা যত্ন করে রেখে দিতাম! পুরোনো কাগজপত্তরের সঙ্গে কবে বিক্রি করে দিতাম সেটা, দোকানের ঠোঙা হয়ে চলে যেত কোথায়!

খুব বেশি দামি জিনিস আমার কখনো ছিলই না, সুতরাং সেগুলো হারাবার দুঃখও পেতে হয়নি। তবে দামি না-হলেও অনেককিছু প্রিয় হয়, সেগুলো হারাবার কথা মনে পড়ে। গিরিডিতে গিয়ে উশ্রী জলপ্রপাত থেকে জল ভরতে গিয়ে আমার ওয়াটার-বটলটা ভেসে চলে গিয়েছিল। প্রায় পনেরো বছর আগের কথা, এখনো দেখতে পাচ্ছি জলের প্রবল তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ওয়াটার-বটলটা, আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছি। আর সেই ফ্লাস্কের ঢাকনাটা?

দুই বন্ধু মিলে ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছিলাম কোথায় যেন। বাঙ্কে উঠে বসে আছি, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছি! সঙ্গে ফ্লাস্ক ছিল, তার ঢাকনাটাই আমাদের গেলাস। সেটাকে একবার ধুতে হবে, ধোওয়ার পর ময়লা জলটুকু ফেলা দরকার, কিন্তু ওপর থেকে জানলা পর্যন্ত হাত যায় না। হিন্দি জ্ঞানের অভাবে সেবার কী কাণ্ড হলো—জলসুদ্ধু ফ্লাস্কের ঢাকনাটা নিচের দিকে বাড়িয়ে একজন হিন্দুস্থানীকে বললাম, ইয়ে ফেক দিজিয়ে তো! লোকটি আমার মুখের দিকে একটু তাকাল,

কী যেন বোঝবার চেষ্টা করল, তারপর ঢাকনাটা ফেলে দিল জানলা দিয়ে।

একটা ওয়াটারম্যান কলম ছিল একসময়, খুব গর্ব ছিল সেটাকে নিয়ে। ওরকম মডেলের কলম এখন দেখা যায় না। তখন বাড়ি থেকে হাতখরচ বিশেষ কিছু পেতাম না, ট্রামের একটা মান্থলি টিকিট দেওয়া হতো আমাকে। একদিন দোতলা বাসের জানলায় একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখে মাথা ঘুরে গেল, ট্রামের বদলে বাসে উঠে পড়লাম। সেইদিনই পকেট মারা গেল কলমটা।

টাকাপয়সার হিসেব করতে বসলে, হিসেব না-মিললে শুনেছি লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কী কী জিনিস হারিয়েছি তার হিসেব নিতে গিয়ে দেখলাম, একটুও কষ্ট হচ্ছে না সেই সব উধাও দ্রব্যের জন্য। বরং ঘটনাগুলো মনে পড়ায় স্মৃতির একধরনের মধুর শিরশিরানি বোধ করছি। কখনো-কখনো হাসি পাচ্ছে।

শুধু একটি কথা ভেবে দুঃখ হয়। জীবনে এ পর্যন্ত অনেক বন্ধু হারিয়েছি। কত প্রিয় বন্ধু দূরে চলে গেছে, কতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেলে সহজে আর নতুন বন্ধু হতে চায় না। এখন শুধু একে-একে বন্ধু হারাবার পালা। সেইকথা মনে পড়লেই বুকের মধ্যে টনটন করে।

১১

আপনাদের এখান থেকে তো পাকিস্তানের বর্ডার খুব কাছে, তাই না?

—এই তো, মাইলখানেক। ঐ যে তালগাছগুলো দেখছ, ওর ওপাশেই।

—লোকজন বর্ডার পেরিয়ে যাতায়াত করে না?

—হরদম হরদম! পাঁচটা টাকা দিলেই দালালরা ওপারে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেয়। এপারেও সেই সিস্টেম। আর স্মাগলিংও হচ্ছে প্রচুর। চলে নাই-বা কেন, সারা বর্ডার জুড়ে তো আর পুলিস বসিয়ে রাখতে পারে না! পুলিস থাকলেই বা কী, ডানহাত-বাঁহাতের ব্যাপার—

—এদিকে রিফিউজি আসেনি?

—আসেনি আবার!

হালদার মশাই চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতন বললেন, আরে ভাই, কী বলব তোমাকে! কী সুন্দর নিরিবিলি ছিল জায়গাটা আগে। এই বাঙালরা আসবার পর একেবারে

ছারখার করে দিল! জায়গাটা নোংরা করেছে কি রকম, ওদের একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা, তার ওপর আবার দল পাকানো—

আমি একটুও দমে না গিয়ে বললুম, হ্যাঁ সত্যি, বাঙালরা আসবার পর পপুলেশন এমন বেড়ে গেছে হঠাৎ এক-একটা জায়গায়!

—শুধু পপুলেশন বেড়েছে নাকি? দ্যাখো তো পাঞ্জাবে, ওখানকার রেফুজিরা কি রকম অ্যাকটিভ! গায়ে খেটে দুদিনের মধ্যে কি রকম দাঁড়িয়ে গেছে সবাই! আর বাঙালরা, কাজকর্ম করার দিকে মন নেই, খালি বাকতাল্লা আর চেচামেচি। এক-একজনের আবার তেজ কি! এসেছিস আমাদের গাঁয়ে—কোথায় একটু ভদ্র হয়ে থাকবি, তা না—এই জন্যই তো বাঙালদের—

—অর্থাৎ কিনা এখানকার বাঙালদের চেয়ে পাঞ্জাবের বাঙালরা অনেক ভালো!

—পাঞ্জাবের বাঙাল? হাঃ হাঃ হাঃ—রিফুজি মানেই বাঙাল বলছো? তা মন্দ নয়।

কথা হচ্ছিল মালদার এক গ্রামে। আমার মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আছে। এদিকটায় কখনো আসিনি শুনে আমার এক বন্ধু তার কাকাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে।

হালদার মশাই অতি সজ্জন লোক, এক সময় ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, এখন সব জমিজমা গেছে, এখন চিনির ব্যবসা করছেন। মাঝারি অবস্থা কিন্তু অতিথি-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি নেই। আমি ওর ভাইপোর বন্ধু এবং শহুরে লেখাপড়া শেখা ছেলে হয়েও গ্রামে এসেছি—আমাকে এমন বেশি খাতির করতে লাগলেন যে রীতিমতন অস্বস্তি বোধ করতে হয়। আমার স্নান করার জন্য গরম জলও দিতে চান—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

হালদার মশাই প্রায় সারাটা জীবন গ্রামে কাটালেও এমনিতে বিশেষ গোঁড়ামি নেই। আমি ওর ছেলের বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও বললেন, সিগারেট-টিগারেট খাওয়ার যদি অভ্যেস থাকে আমার সামনে লজ্জা ক'রো না। লজ্জা করে শুধু শুধু দম আটকে থাকবে কেন? আমার নিজের তো একদিন বিড়ি না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। উনি নিজে ব্রাহ্মণ, কিন্তু জাতের বিচার তেমন নেই, গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান অনেকেই তাকে মানে।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই বাঙালদের বিষয়ে। বাঙালদের ওপর ওঁর বেশ একটা চাপা রাগ আছে। আমার সামনে একগাদা বাঙালদের নিন্দে করে ফেললেন। আমি হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলাম। হালদার মশাই আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করেননি—ধরেই নিয়েছেন, আমিও একজন ঘটি। এখন আমি মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। নিজে বাঙাল

হয়ে অন্য বাঙালদের নিন্দে অনবরত শোনা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে একটা অদ্ভুত ভদ্রতাবোধে পেয়ে বসে। আমার মনে হলো, এখন যদি হালদার মশাইয়ের কাছে আমি আত্মপরিচয় দিই, তাহলে উনি দারুণ লজ্জায় পড়ে যাবেন—আমার দিকে আর তাকাতে পারবেন না। সেই লজ্জায় ওকে ফেলতে আমার ইচ্ছে হলো না। আবার ওর কথায় সায় দিয়ে গেলে মনে হবে, আমি বাঙালত্ব অস্বীকার করে ঘটিদের দলে ভিড়তে চাইছি। যদিও আমি প্রকৃত অর্থেই বাঙাল এবং রেফিউজি। আমার বাবা ঠাকুর্দা ছিলেন পূর্ববঙ্গে আমিও বাল্যকালে ছিলাম, এবং ওখানে আমাদের বাড়ি ছিল, এখানে এক টুকরো জমিও নেই।

হালদার মশাই আমার কাছে খুব অন্তরঙ্গভাবে গোপনে বাঙালদের নিন্দে করেছিলেন, বাড়ির বাইরে অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে আর বাঙাল বলেন না। বলেন ইস্টবেঙ্গলের লোক। একটু রেগে গেলে 'রিফিউজিগুলো'!

হালদার মশাইয়ের সাত-আট বছরের ছেলেকে একজন যুবক বাড়িতে পড়াতে আসে। রোগা চেহারার লাজুক ছেলেটি। সে একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছে, হালদার মশাই আমাকে বললেন, ঐ যে ছেলেটি দেখলে, খুব ভালো ছেলে, মন দিয়ে পড়ায় রতনকে। ছেলেটি বাঙাল হলেও খুব সিনসিয়ার—পড়াশুনোয় খুব আগ্রহ। বাঙালদের মধ্যে এরকম ভালো ছেলেও দুটো-একটা আছে, আই মাস্ট অ্যাডমিট—

হালদার মশাইয়ের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তাঁর মা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি এসে হালদার মশাইকে বললেন, ও খোকন, দুটো বাঙাল ছোড়াকে ডেকে নে আয়, নারকেলগুলো পেড়ে দেবে। ওরা এমন তড়বড়িয়ে গাছে উঠতে পারে—

হালদার মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত হাস্যে বললেন, 'লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, লাজ নাই কিন্তু!' আমি হাসবো না কি করবো বুঝতে পারলুম না।

এই রকম অবস্থা আমার আগে আরো দু'একবার হয়েছে। অন্য ধরনেরও। কফি হাউসে একবার এক মাড়োয়ারী বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম। মাড়োয়ারী মাত্রেই তো আর কুটিল ব্যবসায়ী নয়। আমার সেই বন্ধুটি সেবার বি-এ পরীক্ষায় ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, বেশ গরীব এবং জলের মতন বাংলা বলে। হঠাৎ আর এক বন্ধু আমাদের টেবিলে উপস্থিত হয়েই বলা শুরু করল, আরে ভাই, মাড়োয়ারীদের জ্বালায় আর পারা গেল না। আজ বড়বাজারে গিয়েছিলাম, এক ব্যাটা ভুঁড়িদাস—। আমি বন্ধুটিকে যতই চোখ টিপছি, সে কিছুতেই বোঝে না। মাড়োয়ারী বন্ধুটি মিটিমিটি হাসতে লাগলো আর বলল, যা বলেছেন! মাড়োয়ারীর জাতটাই দেশটাকে...

হালদার মশাইয়ের মেয়ে কলেজে পড়ে, ছুটিতে এই সময়েই গ্রামের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটির নাম অর্চনা, নেহাত মন্দ নয় গোছের চেহারা—তবে শহরের কলেজে পড়ে বেশ স্মার্ট হয়েছে। আমাকে দেখে অন্তঃপুরিকা হয়ে রইল না, সপ্রতিভভাবে গল্প করতে লাগল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, অর্চনাকে আমার ভালোই লাগছিল। মালদার কলেজে পড়ে অর্চনা, কলকাতা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল, আমাকে বার বার কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এদিকে হালদার মশাইয়ের বাঙাল ফিক্রেশন—যে-কোনো কথাতেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বাঙালদের কথা আনবেনই। গভর্নমেন্ট তার কিছু জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে রেফিউজিদের দিয়েছে, এই হলো প্রথম রাগের বিষয়। রেফিউজিদের দিতে না হলেও যে গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিতই—সেটা ভুলে যান। বাঙালদের সম্পর্কে তাঁর আর একটা রাগের কারণ, বাঙালরা নাকি বড্ড বেশি রগচটা, কথায় কথায় ঝগড়া করতে আসে। আর খাইছি, শুইছি ধরনের ভাষা তাঁর দ'কানের বিষ।

অর্চনা বলল, জানো বাবা, আমাদের ক্লাসে দুটো বাঙাল মেয়ে আছে, তাদের কথা শুনে কিন্তু একদম বোঝা যায় না। আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর ওরা ওদের বাড়িতে একদিন আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল—প্রত্যেকটা খাবারেই এত ঝাল না, উঃ, জিভ জ্বলে গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম—! তার ওপর আবার শুটকি মাছ, আমার তো এমন বমি পেয়ে গেল...

হালদার মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কথা শুনলে ঠিকই বোঝা যায়, যতই লুকোবার চেষ্টা করুক, বাঙালদের কি চেনা যায় না?

আমি কাটা হয়ে বসে রইলাম। হালদার মশাই আমাকে বুঝতে পারেননি। এখন বুঝতে পারলে চোর ধরা পড়ার অবস্থা হবে। আমি আর আমার আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছি না। এমনকি এ কথাও আমার মনে হলো, আহা, ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে নিরিবিলিতে একটু বাঙালদের নিন্দে করছে—তাতে আমি বাগড়া দিই কেন? পরনিন্দার মতন সুখরোচক জিনিস আর নেই—ক'জনই বা এ জিনিস করে না?

অর্চনা আমাকে বলল, আমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখেছেন সব? চলুন, নদীর পাড়টায় যাবেন?

—নদীর পাড় খুব সুন্দর বুঝি?

—আগে খুব সুন্দর ছিল—ফাঁকা মাঠ, ঝপঝপ করে পাড় ভেঙে পড়ত—এখন আর বেশি যাই না—এখন ওদিকটা রিফুজি কলোনি হয়েছে তো! বাঙাল ছেলেগুলো এমন প্যাট প্যাট করে তাকায়—যেন কোনোদিন মেয়ে দেখেনি—

আমি আমার চোখে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, আমারও দৃষ্টি প্যাটপেটে কিনা।

হালদার মশাইকে আমি বললুম, কাকাবাবু, কাল তো চলে যাব, আমাকে একটু পাকিস্তানের বর্ডারটা দেখিয়ে দিন।

তিনি বললেন, ও আর দেখার কি আছে? দেখে কি কিছু বোঝা যাবে?

—তবু চলুন।

ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ঐ যে ঐ তালগাছের লাইন, ওখানেই পাকিস্তানের শুরু।

আমি চুপ।

উনি আবার বললেন, ঐ একটা খড়ের বাড়ি দেখছ? বাড়িটা পড়েছে পাকিস্তানে, আর উঠোনটা ইণ্ডিয়ায়। হেঃ হেঃ হেঃ—

আমি চুপ।

—এরকম ভাগাভাগির কোন মানে হয়? সাহেবরা একটা দাগ টেনে দিল—আর অমনি দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল! আর আমাদের ন্যাতারাও সব যেমন!

আমি চুপ।

—কিহে, চুপ করে আছ যে?

—এমনি, মনটা খারাপ লাগছে।

—কেন?

—এমনিই আর কি! আচ্ছা কাকাবাবু, যদি মনে করেন, পার্টিশানের দাগটা আরো দেড় দু' মাইল এদিকে পড়ত, তাহলে আপনার বাড়িটাও পাকিস্তানে পড়ে যেত। আপনিও তাহলে রিফিউজি হয়ে—লোকে আপনাকে বাঙাল বলত—

—ইঃ, বললেই হলো? আমার এখানে সাত পুরুষের বাস—

—ওখানেও অনেক বাঙালের—

হঠাৎ হালদার মশাই একটু চুপসে গেলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন, ওরে বাবা, বুঝি, বুঝি, ঠিকই বুঝি। ভিটেমাটি ছেড়ে এতগুলো লোক এসে কত দুঃখে পড়েছে—আমাদেরই মতন তো সব কিছু—তবু মাঝে মাঝে মনে থাকে না। বুঝলে না, মানুষ ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই বেশির ভাগ সময়—তবু মনের ভেতরে—

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে গেলাম আবার।

১২

দারুণ বৃষ্টিতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে, কলকাতায় এখন আর কিছুই ঠিকঠাক নেই। জলেডোবা ট্রামগুলো এখন স্টিমারের মতন, বাসের পাত্তা নেই, মাঝে-মাঝে যে দু-একটি আসছে, সেগুলোকে বাস না-বলে ভিজে আলুর বস্তা বলাই ভালো। আজ যার যে-সময়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, ফিরতে পারবে না, অনেক অ্যাপয়েনটমেন্ট আজ অপূর্ণ থাকবে, অনেক মুমূর্ষু রোগী ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছুবে না, অনেক বস্তিতে এখন মিনি-বন্যা।

টানা দুঘণ্টা ধরে দুর্দান্ত তেজের সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, চৌরঙ্গীতে পর্যন্ত হাঁটুসমান জল।

অধিকাংশ মানুষই নিমকহারাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে যারা প্রার্থনা করে কবে বৃষ্টি আসবে, তারাই আবার বর্ষাকাল এসে গেলে বলে, ধ্যাৎ, বৃষ্টি যে কবে শেষ হবে! অনেকে চায়, অফিস টাইমে বৃষ্টি হবে না, বৃষ্টি হওয়া উচিত শুধু রাত্তিরে, ঘুমের আরামের জন্য। যথেষ্ট বৃষ্টি না-হলে চাষবাসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, একথা সবাই জানে, তবু বৃষ্টির বাহুল্যে অনেকের ক্রোধ। কেউ-কেউ আবার বলে, কলকাতা শহরে তো আর চাষ বাস হচ্ছে না, সুতরাং কলকাতা শহরটা বাদ দিয়ে গ্রামে ট্রামে বেশি বৃষ্টি হলেই তো পারে। অর্থাৎ রেডিমেড জামার মতন প্রকৃতিও ঠিকঠাক ফিট করে যাক জীবনের সঙ্গে।

বৃষ্টির সময়টা আমার খারাপ লাগে না। মানুষ তো আর সবসময় দেশের অবস্থা কিংবা সামগ্রিক সামাজিক ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা করে না, অনেক সময়ই সে ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগা নিয়ে মগ্ন থাকে। ব্যক্তিগতভাবে বর্ষা আমি বেশি ভালোবাসি। জামা প্যান্ট নষ্ট হয় বটে, অনেক কাজ অসমাপ্ত থাকে—কিন্তু আমি তো আর তেমন ব্যস্ত কেজো মানুষ নই, বৃষ্টির সময় দিনের আলোটা যেরকম নরম আর চাপা হয়ে আসে, সেটা আমার খুব পছন্দ। তাছাড়া, শহুরে মানুষের সবসময় এত তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততা, কোথাও পরের বাড়ি জলের দামে নীলাম হয়ে যাচ্ছে শুনে ছুটে যাওয়ার মতন ব্যস্ত ভঙ্গি—এসবই থেমে থাকে ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে, আমার বেশ লাগে।

জুতোর মায়া না-করেই জলের মধ্যেই ছপছপ করে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, চৌরঙ্গীর একটা সিনেমা হলের সামনে থেকে কে যেন আমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকল, এই নীলুদা, নীলুদা—।

তাকিয়ে দেখি, আমার মাসতুতো বোন টুমপা। খুব সেজেগুজে অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজে, তখনো বৃষ্টি পড়ছে সমানে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখানে একা-একা দাঁড়িয়ে কী করছিস?

—দ্যাখো না, একটা সিনেমা দেখতে এসেছিলাম, কী রকম আটকে গেছি! কী করে বাড়ি যাব?

—একা সিনেমায় এসেছিলি কেন?

—একা নয়, সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছে।

তাকিয়ে দেখি, বন্ধু নয়, বান্ধবী। টুমপারই সমবয়েসি একটি মেয়ে, এ-ও সেজেছে খুব, তবে মুখটা বিষণ্ণ।

টুমপা বলল, এর নাম ইন্দ্রাণী, আমরা একসঙ্গে গান শিখি। তুমি আমাদের একটু বাড়ি পৌঁছে দাওনা!

—আমি তো এখন বাড়ি যাব না!

—এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবে?

—যেখানেই যাই না! তোরা এই বৃষ্টির মধ্যে একা-একা সিনেমায় এসেছিলি কেন? এখন নিজেরা বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা কর!

—দুপুরে কী বৃষ্টি ছিল নাকি?

—মেঘ তো ছিল! তাছাড়া সঙ্গে কোন ছেলেবন্ধুকে নিয়ে আসিসনি কেন? তোর বয়েসের মেয়েদের উচিত সবসময় ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় আসা—অথবা বাড়ির লোকের সঙ্গে, নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারিস না; আমি পৌঁছে দিতে পারব না।

—তুমি যদি আমাদের ফেলে চলে যাও, তাহলে আমি ছোট মাসিকে ঠিক বলে দেব কিন্তু।

ইন্দ্রাণী নামের মেয়েটি এবার বলল, আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিন। ফিরতে দেরি হলে আমার বাড়িতে ভীষণ চিন্তা করবে!

মেয়েটির দিকে আমি একটুক্ষণ চেয়ে রইলাম। মাসতুতো বোনের বান্ধবীকে কী আপনি বলে কথা বলা উচিত? সরাসরি তুই-ও বলা যায় না। দুজনের দিকেই সমানভাবে তাকিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।

টুমপা বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব?

—হাঁটবে! হাঁটা ছাড়া আর তো কোনো যাওয়ার উপায় নেই।

—এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটব? সেই সাদার্ন এভিনিউ পর্যন্ত? অসম্ভব! ব্রঙ্কাইটিস অথবা নিউমোনিয়া হয়ে যাবে!

—তাহলে দাঁড়িয়ে থাক। এইসব বাসে উঠতে পারবি? আমি এরকম ভিড়ের বাসে কক্ষনো উঠি না। দাঁড়া তাহলে, বৃষ্টি থামুক, তার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদে রাস্তায় জল কমলে...অন্তত সাড়ে নটা-দশটার আগে তো নয়ই।

—আহা-হা, এত কিপ্টে কেন তুমি? একটা ট্যাকসি ডাকতে পারছ না? না-হয় আমরাই ভাড়া দেব!

মেয়েদের অবুঝপনা বলে একেই! এটা কী কিপ্টেমীর কথা হলো? এমনি দিনেই কথা নেই, আর আজ এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সব রাস্তায় এককোমর জল—এখন চৌরঙ্গী থেকে একটা ট্যাকসি জোগাড় করার চেয়ে একটা নতুন মোটরগাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আপন মনে বৃষ্টিটা উপভোগ করতে-করতে সাব ভাবছিলাম, তার মধ্যে এ কী বাধা!

ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখন বাড়ি না-ফিরলে খুব অসুবিধে হবে?

মেয়েটি শুকনো মুখে বলল, খুব। মা আমাকে আসতেই বারণ করছিলেন আজ।

—বাড়িতে খুব কড়া শাসন বুঝি?

—না না, সেজন্য নয়। কিন্তু আজ একটা অন্য ব্যাপার আছে।

নিজের মাসতুতো বোনের জন্য যতটা কষ্ট স্বীকার করা যায়, তার বান্ধবীর জন্য খানিকটা বেশি করতেই হয়। সদ্য-পরিচিতা যুবতীর জন্য খানিকটা শিভালরি না-দেখালে পুরুষ সমাজের কাছেই আমি নিন্দিত হব।

তারপর মিনিট পনেরোর চেষ্টায় কী করে যে আমি একটা ট্যাকসি জোগাড় করলাম, সে কাহিনী না-বলাই ভালো। সবাই ভাববেন, আমি নিজের কীর্তি নিয়ে অহংকার করছি।

ট্যাকসিতে উঠে টুমপা বলল, ইন্দ্রাণী এবার এম. এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে, দারুণ ভালো ছাত্রী, বুঝলে নীলদা, আমার খুব বন্ধু—।

ইন্দ্রাণী কিন্তু একটি কথাও বলল না, মুখখানা ম্লান, হয়তো কোন ব্যাপারে চিন্তিত। টুমপা খুব সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের, একাই অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল।

আমি একসময় টুমপার মাথায় একটা গাট্টা মেরে বললাম, এত কষ্ট করে ট্যাকসি ধরে দিলাম, আমাকে ধন্যবাদও জানালি না? আমার সঙ্গে দেখা না-হলে এতক্ষণ তোরা কী করতিস?

—ইস, তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাব কী!

যে রাস্তা দিয়ে এখন ট্যাকসিটা যাচ্ছে, সেটা জলে থৈ-থৈ করছে, কিন্তু মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তার আলোও নিভে গেছে। হঠাৎ তিন-চারজন লোক জল ছপছপিয়ে বিপজ্জনকভাবে আমাদের ট্যাকসির সামনে দিয়ে এমনভাবে ছুটে গেল যে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল আমাদের ট্যাকসি। আমরা হুমড়ি

খেয়ে পড়লাম। সামনে তাকিয়ে দেখি, তিনজন লোক মিলে একটি লোককে ধুপধাপ করে ঘুঁষি মারতে শুরু করেছে। মনে হয় নিজেদের দলের মধ্যেই ঝগড়া, যদিও আক্রান্ত লোকটি চিৎকার করছে তারস্বরে।

আজকাল এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানত্যাগ করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমাকে কিছু বলতে হলো না, ট্যাকসি-ড্রাইভারই স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ঘাড় ফিরিয়ে আমরা তখনো পিছনের মারামারি দেখছি, ইন্দ্রাণী বলল, আগেকার দিন হলে রাস্তায় এরকম মারামারি দেখলে সবাই গাড়ি থামাত, নেমে মারামারি ছাড়িয়ে দিত।

কথাটা কী আমাকে উদ্দেশ করে বলা? আমার উচিত ছিল ঐ আক্রান্ত লোকটিকে বাচানো? এই নির্জন রাস্তায়, এককোমর জলের মধ্যে ট্যাকসিতে দুজন মেয়েকে বসিয়ে রেখে? আমি অবাক হয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালাম।

টুমপা বলল, পাগল নাকি! ঐসব গুণ্ডাদের মারামারির মধ্যে কেউ যায়?

আমি ঈষৎ ঠাট্টার সুরে ইন্দ্রাণীকে বললাম, তুমি বুঝি সিনেমায় এইমাত্র এরকম একটা দৃশ্য দেখে এলে? বাট ল্যাঙ্কাস্টার কিংবা জেমস বণ্ড একাই দশজন লোককে ঘুঁষি মেরে ফ্ল্যাট করে দেয়।

ইন্দ্রাণী আর কিছু বলল না! একটু বাদেই তার বাড়ি এসে গেল। নামার সময় শুধু শুকনো মুখে বলল, চলি।

টুমপাকে বাড়ি পৌঁছুতে গিয়ে ওর সঙ্গে নামতেই হলো, বাড়ি পৌঁছে দেবার কৃতজ্ঞতা হিসেবে টুমপা আমাকে ভালো এক কাপ কফি খাইয়ে দিল!

বাড়ি ফিরে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বর্ষার রাত্রিটা তো মাঠে মারা গেলই, তারপরও দুটো দিন মেজাজ ভালো হলো না। ইন্দ্রাণী মেয়েটি ভারী সুন্দর, সে তো আমার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতেও পারত, কিন্তু ওরকম গঞ্জনা দিয়ে গেল কেন? অন্যায়-অবিচার দেখলে সব পুরুষমানুষের মনের মধ্যেই খচখচ করে, প্রতিকার করতে না-পারলে মনের মধ্যে একটা গ্লানি আসে—বিরলে আমরা দুঃখ বোধ করি। কোন মেয়ের মুখ থেকে সেকথা শুনতে কী আর ভালো লাগে? গ্লানিবোধ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দিনকয়েক বাদে টুমপার সঙ্গে আবার দেখা। বিরাট উৎসাহের সঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে বলল, নীলুদা, জানো তো, দারুণ ব্যাপার! ইন্দ্রাণী এম. এস-সিতে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে...! আমি বলেছি, তোমাকে একদিন খাওয়াতে।

—আমাকে কেন?

—বাঃ, ইন্দ্রাণী কী বলেছে জানো না? তুমি নাকি দারুণ লাকি লোক!

সেদিনই ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার কথা তো, ও খুব মন খারাপ করে ছিল। আমিই ওকে জোর করে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ঐরকম বৃষ্টি, বাড়ি ফেরার উপায় নেই—এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা। বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাও হয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরেই ও গুড নিউজ শুনল। তোমার সম্পর্কে তো ও একেবারে উচ্ছ্বসিত। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলেই—

আমি সামান্য হাসলাম। এই ব্যাপার! পরীক্ষার রেজাল্টের দুশ্চিন্তায় মুখ শুকনো করে ছিল ইন্দ্রাণী। আমার সঙ্গে সেইজন্যই ভালোভাবে কথা বলেনি—খুবই স্বাভাবিক। রাস্তায় মারামারি দেখে ও হয়তো এমনিই একটা মন্তব্য করেছিল, ভাবেনি যে সেটাতে আমি কোন আঘাত পাব। অথচ আমি দুদিন মন খারাপ করে রইলাম।

মেয়েরা যে না-জেনে কত আঘাত দেয় পুরুষদের!

১৩

সমুদ্রের ওপরে যে গোপালপুর, সেখানে আমি দুবার বেড়াতে গিয়েছি। একই জায়গা, একই সমুদ্র অথচ দুবার আমার কাছে ঠিক বিপরীত দরকম লেগেছিল। এমনকী, প্রথমবার সমুদ্রের প্রায় ওপরই এক বাড়িতে ছিলাম যদিও, কিন্তু সমুদ্র প্রায় দেখিইনি বলা যায়।

প্রথমবার গিয়েছিলাম পাঁচ বন্ধু মিলে। পাঁচজনেরই বয়স প্রায় সমান, কিন্তু রুচি আলাদা-আলাদা, চেহারা নানাধরনের। আমার রোগা-পটকা চেহারা বলে আমিই ছিলাম দলের মধ্যে সব চেয়ে অনুল্লেখযোগ্য সদস্য, কোন ব্যাপারেই আমার মতামত গ্রাহ্য হতো না।

সেবার কোথায় গিয়ে থাকব ঠিক ছিল না কিছু। ট্রেনে বহরমপুর পর্যন্ত গিয়ে তারপর বাসে গোপালপুর। বাস থেকে নামামাত্রই নুলিয়ারা ঘিরে ধরেছিল—ওখানকার নুলিয়াবা অনেকটা পাণ্ডা আর নুলিয়ার সমাহার, অর্থাৎ তারাই বাড়ি ঠিক করে দেবে, খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে, আবার সমুদ্রসাঁতারে সঙ্গী হবে। আমরা প্রত্যেকেই সাঁতার জানি, সমুদ্রে সাঁতার কাটাও অভ্যেস আছে এবং জীবনসমুদ্রে আমাদের কোন কর্ণধার রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি। এইজন্য প্রথমেই নুলিয়াদের সঙ্গে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। নুলিয়ারা প্রথমে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করছিল কে আমাদের দখলে নেবে এই জন্য। আমরা কারুকেই নিলাম না বলে ওরা এককাট্টা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গেল, শাসানি দিল যে ওদের

সাহায্য ছাড়া আমরা বাড়ি পাব না। খাবার দাবার পাব না।

সবই পাওয়া গেল অবশ্য। বেলাভূমির ঠিক পাশেই একটা গোটা বাড়ি পেলাম, ভাড়াও সস্তা। বাজারহাট করে দেওয়া ও খাবার জল এনে দেবারও লোক জুটে গেল। রাস্তায় বেরুলে কখনো-কখনো নুলিয়ারা দল বেঁধে আমাদের পিছনে-পিছনে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব আওয়াজ দিত, তবে ওদের সাহস বেশি ছিল না, আমরা একটু রুখে দাঁড়ালেই ওরা পালাত, এই পর্যন্ত। ওখানে কোন বাঙালিবিদ্বেষ বা প্রাদেশিকতা অবশ্য চোখে পড়েনি—সাধারণ অধিবাসীরা বেশির ভাগই তেলেঙ্গি, তারা বেশ সরল ও ভালো মানুষ।

আমি ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসিনি। তাহলে বানিয়ে-বানিয়ে কোন রোমান্সের ঘটনা লিখতে হয়। আমি গল্প একদম বানাতে পারি না, একটু আধটু বানাতে গেলেই ধরা পড়ে যাই। সেবার কোন রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটেনি।

মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচজন ছেলে বাইরে বেড়াতে গেলে যা হয়। দলের মধ্যে একজন নিজে-নিজেই ক্যাপ্টেন হয়ে যায়। একজন একটু গোঁয়ার ধরনের, যার-তার সঙ্গে মারামারি বাধাতে গেলে অন্য বন্ধুরা তাকে থামায়। একজন একটু বেশি স্বার্থপর, একজন ভালোমানুষ কিংবা ক্যাবলা, একজন মিটমিটে পাজী। অর্থাৎ গোটা মধ্যবিত্ত সমাজটারই প্রতিনিধিবর্গ।

দল বেঁধে বাইরে যাবার আনন্দও যেমন, তেমনি তাতে অনেক ফাঁকও থেকে যায়। এক হিসেবে আমরা কলকাতারই একটা বৈঠকখানা তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম গোপালপুরে, সারাদিন সেই ধরনেরই আড্ডা। সমুদ্র একটা ছিল বটে, তবে সেটা নেহাতই ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে, বৈঠকখানার ক্যালেণ্ডারেও তো সমুদ্রের ছবি থাকে, কখনো-কখনো তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, বাঃ, বেশ ছবিটা তো! সমুদ্রে স্নান করতামও দু-তিনঘণ্টা ধরে, তবে যে ধরনের রসিকতা ও হাসি-পরিহাস হতো তখন—তাতে কলকাতার গঙ্গায় স্নানের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই।

আমাদের রুটিন ছিল, পেট ভরে ঘুমোনো, মন ভরে খাওয়া আর দম ভরে আড্ডা। মাছ ওখানে খুব সস্তা বলে আমরা বাঙালির ছেলে বেশি বেশি সমুদ্রের মাছ খেয়ে সবাই পেট খারাপ করে ফেললাম। আর একটা প্রধান কাজ ছিল, সকাল-সন্ধেতে বেড়াতে বেরিয়ে মেয়েদের সম্পর্কে চাপা মন্তব্য ও কিছুদূর ব্যর্থ অনুসরণ। কাচা বয়স তো, ঐ দোষ তো থাকবেই। কিন্তু যেহেতু বানিয়ে গল্প লিখতে বসিনি তাই স্বীকার করতে দোষ নেই যে, শেষ পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গেই আমাদের আলাপ হয়নি। সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল না, বাঙালি রূপগরবিনী মেয়েও ছিল, কিন্তু কেউ আমাদের পাত্তা দেয়নি। আমাদের দলের মধ্যে দু-একজন বলেছে বটে ঐ লাল শাড়ি-পরা মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে কিংবা

ঐ মেয়েটা এমনভাবে আমার দিকে চাইছে না, নিশ্চয়ই আমাকে চেনে কিংবা ঐ সবুজ শাড়িকে দ্যাখো, ডেফিনিট কেস, একটু এগুলেই হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি অবশ্য।

সাতদিন থাকার কথা ছিল, ছদিনের মাথায় আমরা ফিরে এলাম। তার কারণ, তিনদিন পরেই আমাদের একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই পেটখারাপ সারছিল না, তৃতীয়ত টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছিল। চতুর্থত, আমাদের বাড়ির ছাদটায় রোজ রাত্রে বিশ্রী ধরনের ধুপধাপ আওয়াজ হতো। দল মিলে ছাদে উঠে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, কিছুই দেখতে পাইনি—কিন্তু আওয়াজ রোজই বাড়ছিল। ভূত বিশ্বাস করা আমাদের চরিত্রে মানায় না—কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছিল ঠিকই—এটা নুলিয়াদের উৎপাত বলে ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। কলকাতায় ফিরে এসে অন্যদের কাছে গোপালপুরের বর্ণনা দিতে বললাম, ওখানে মাছ সস্তা, সহজে বাড়িভাড়া পাওয়া যায়, আশেপাশে আর দেখবার কিছুই নেই অবশ্য—পুরীর মতন। আর সমুদ্র, হ্যাঁ, সমুদ্র তো আছেই, সে আর নতুনত্ব কী, সমুদ্রের পারে গেলে তো সমুদ্র দেখা যাবেই।

দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম একা। তাও দৈবক্রমে। আমার এক বন্ধুর দাদা বিদেশ থেকে মেমবউ নিয়ে এসেছেন। মেমবউদির এদেশের গরম একেবারে সহ্য হচ্ছে না—তাকে পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল। পাহাড়ের বদলে সমুদ্রই ঠিক হলো, পুরী কিংবা দীঘা এই নিয়ে দোনামনা হচ্ছিল, আমি হঠাৎ বললাম গোপালপুর-অন-সী যান-না। বেশ নিরিবিলি। বন্ধুর দাদা বললেন, ঠিক আছে, গোপালপুরই যাওয়া যাক, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। বেশ একটা বড় দল মিলে গেলে...

হাওড়া স্টেশনে সবার দেখা করার কথা ছিল কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তেও ওঁরা কেউ এসে পৌঁছলেন না—আমার টিকিট আমার কাছেই ছিল, সেটা নষ্ট না-করে আমি একাই ট্রেনে চেপে বসলাম। পরে অবশ্য শুনেছিলাম, কলেজস্ট্রিটে একটা সাংঘাতিক বাস অ্যাকসিডেন্টে এমন ট্রাফিক জাম হয়েছিল যে সেদিন ঐ রাস্তায় অনেকেই ট্রেন ধরতে পারেনি।

পাকেচক্রে আমি একা হাজির হলাম গোপালপুরে। এবার আর পুরো বাড়ি ভাড়া করিনি, উঠেছিলাম মিসেস সোম-এর লজে। মিসেস সোম বাঙালি ক্রিশ্চান, ষাটের ওপর বয়েস, একা এই লজটি চালান। ছোটখাটো পরিবার কিংবা একা কেউ গেলে ওঁর ওখানে বেশ সুন্দরভাবে থাকা যায়। ওখানে খাওয়া-দাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে, আবার ইচ্ছে করলে কেউ রান্না করেও খেতে পারে।

গোলাপখাস আমের মতন টুকটুকে গায়ের রং মিসেস সোমের, মাথার

চুলগুলোও ধপধপে সাদা, মুখের হাসিটা খুব মা-মা ধরনের। সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলেন, কিন্তু আমাকে দেখে সরাসরি বাংলায় বললেন, সাতদিন চুপচাপ থাকো, খাও দাও, দেখবে একেবারে স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল, প্লুরিসি না টি. বি?

আমার রোগাপটকা চেহারা দেখে উনি ধরেই নিয়েছেন যে আমি ঐধরনের কোন অসুখ থেকে উঠে শরীর সারাতে এসেছি। তাছাড়া একা-একা বোধ হয় আর কেউ আসে না। আমার পক্ষে এখন আর অস্বীকার করেও লাভ নেই। মৃদু-মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

একদিন বাদে বন্ধুর দাদার টেলিগ্রাম পেলাম যে, সেদিন ওরা ট্রেন মিস করে গোপালপুরকে অপয়া বলে ধরে নিয়েছেন এবং পরদিন সকালেই দীঘা চলে গেছেন। আমি যেন সেখানে চলে যাই। গেলাম না, আমি গোপালপুরেই রইলাম।

সারাদিন আমার কিছুই করার নেই। একা-একা ঘুরে বেড়াই অথবা সমুদ্রের মুখোমুখি বসে থাকি। সেই একই গোপালপুর, কিন্তু এবার যেন অন্য একটা জায়গায় এসেছি। এখন আমি জেনেছি এই সমুদ্রের চরিত্র, এর জোয়ার-ভাটা ও রং বদলানো। এখন আমি দেখছি এখানকার মানুষদের, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি নিজেকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, দলবলের সঙ্গে যখন মিশে থাকি তখন যথেষ্ট হৈ-হুল্লায় মেতে উঠতে পারি কিন্তু একা যখন থাকি তখন অচেনা লোকের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা আমার একটুও নেই! অতিরিক্ত লাজুক হয়ে পড়ি। সাত-আটদিনের মধ্যে গোপালপুরে আমার কারুর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হলো না। মিসেস সোম প্রায়ই আমার খোঁজ খবর নিতে আসতেন, কিন্তু তিনি আমাকে অসুখের কথা বলেছিলেন বলে ওর সঙ্গে আর বেশি কথা বলার উৎসাহ পাইনি। মিসেস সোমের লজে পাঁচটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা, একটি ঘর খালি, একটিতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার, অন্যটিতে এক পাঞ্জাবি দম্পতি সব সময় নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আর-একটিতে এক বাঙালি প্রৌঢ় দম্পতি আর তাদের আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। সেই পরিবারের ভদ্রলোকটি নিজে থেকে মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁর স্ত্রীও দু-চারটে কথা বলেছেন, কিন্তু ওঁদের মেয়ের সঙ্গে আমার একবারটিও আলাপ করিয়ে দিলেন না। পাশাপাশি ঘর, মেয়েটির সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছে, কথা হয়নি একবারও।

বিকেলে হাঁটতে-হাঁটতে আমি চলে যেতাম অনেক দূরে। জেলেবস্তির কাছাকাছি। এবার আর মাছ কেনার শখ নেই। গতবার এসে বন্ধুরা সবাই দল মিলে এখানে এক-আধবার এসে সস্তায় মাছ কেনার জন্য দরাদরি করেছি,

আর-কিছুই দেখিনি। এবার অনেক কিছুই চোখে পড়ল।

এই জেলেরা সবাই তেলেঙ্গি, কালো কুচকুচে বার্নিশ করা রং, ভাষা একবর্ণ বোঝা যায় না—দু-একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতে পারে। সন্ধের সময় চারজন জেলে সমুদ্রের পারে বালিতে বসে মাটির ভাঁড়ে করে কী যেন খাচ্ছিল, সম্ভবত দিশি মদ। আমাকে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, কী চাই বাবু আপনার?

আমি বললাম, কিছু চাই না। মাছ কিনতেও আসিনি। তোমরা তো সমুদ্রের অনেক দূরে মাছ ধরতে যাও, সেই মাছ ধরার গল্প শোনাবে?

গল্পের কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। এ তো ওদের জীবন, এ তো গল্প নয়। ওদের সেই সাংঘাতিক জীবনের কথা লেখার মতন ভাষা আমার জানা নেই। সর্য ওঠার আগে ওরা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সূর্য অস্ত যাবার সময়। সারাটা দিন ওরা সমুদ্রের ওপর কাটায় মোচার খোলার মতন নৌকোতে। প্রচণ্ড রোদ, কখনো প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়—সবই যায় ওদের শরীরের ওপর দিয়ে। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ওরা জানে না, ওরা আবার বেঁচে ফিরবে কিনা। প্রত্যেক বছরই দু-চারটে নৌকো জেলেদের নিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যায়। যারা বেঁচে থাকে, তাদেরই-বা কী আছে জীবনের কিংবা বেঁচে থাকার আনন্দ? ভারতবর্ষে জেলেরাই বোধ হয় সব চেয়ে গরীব, সব চেয়ে বেশি শোষিত, বঞ্চিত। আমি দেখেছিলাম, সারাদিন পর জেলেরা ফিরেছে, রোদ্দুরে পুড়ে জলে ভিজে ওদের শরীরগুলো যেন কাঠের মতন, ওদের স্ত্রীরা ওদের গায়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, লোকগুলি যেন বোধহীন, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেলেদের কথা শুনে খানিকটা ভারী অবসন্ন মনে ফিরি আমি বেলাভূমি ধরে। রাত হয়ে গেছে। সমুদ্রের অশ্রান্ত আওয়াজ, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের উজ্জ্বল রেখা, ঠিক মালার মতন। হঠাৎ মনে পড়ে মাইকেলের লাইন, 'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেত! হে জলদলপতি—।' মনে হয়, এই সমুদ্র যেন সত্যিই একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব, কী রাশভারী, কী বিপুল গাম্ভীর্য! তাকিয়ে-তাকিয়ে আর চোখ ফেরে না!

লজে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরেও তক্ষুনি ঘুম আসে না। সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় গিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসি। আগেরবার এসে সমুদ্র দেখার সময়ই পাইনি এবার এত দেখেও ক্লান্তি লাগছে না। আগেরবার সারাক্ষণ কী দারুণ আড্ডা দিয়েছি, এবার আমি প্রায় বোবা। দুবার যেন দুজায়গায় এসেছি।

হঠাৎ চোখ পড়ে, পাশের বারান্দায় সেই বাঙালি মেয়েটিও একা-একা বসে সমুদ্রকে দেখছে। ঐ মেয়েটিও নিঃসঙ্গ। বাবা-মার সঙ্গে আর কত গল্প করবে। মেয়েটিও নিঃসঙ্গ, আমিও তাই; যদি দুজনের...

আমি রসালো ভ্রমণকাহিনী কিংবা কাল্পনিক রোমান্স লিখতে বসিনি। একই জায়গায় দুবার দুরকমভাবে এলে দৃষ্টি কেমন পাল্টে যায়, শুধু সেইটুকুই বলা উদ্দেশ্য। মেয়েটির সঙ্গে আমার শেষ পর্যন্ত আলাপ হয়নি। ক'দিন বাদে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম একটা বিশাল ব্যক্তিত্বময় সমুদ্রের স্মৃতি, একদল নিপীড়িত মানুষের দুঃখবোধ আর ব্যক্তিগত বিষাদ নিয়ে।

১৪

আজকের ফুল কাল শুকিয়ে যায়। কিন্তু পরশুদিন তার কী অবস্থা হয়? আজ যে-গোলাপ শুকিয়ে গেছে, এক সপ্তাহ বাদে সেটা আরো কতখানি শুকনো হবে—সাধারণত লক্ষ করে দেখা হয় না।

কেউ বিশ্বাস করে কিনা জানি না, আমার কাছে একটা বারো বছরের পুরোনো যুঁই ফুলের মালা আছে। বারো বছর যদি এক যুগ ধরা হয়, তাহলে মালাটিকে বলা যায় আমার গত যুগের। ফুলগুলো কিন্তু পচে নষ্ট হয়নি, শুকিয়ে শক্ত হয়ে এখনো সুতোর সঙ্গে গাঁথা। হালকা খয়েরি রং এখন, তবুও যুঁই ফুল বলে চেনা যায়। নাকের কাছে নিয়ে এলে এখনো একটু-একটু গন্ধ পাওয়া যায়—কিংবা সেটা আমার কল্পনাও হতে পারে।

এক যুগ আগে, নাইট শোতে সিনেমা দেখে ফেরার পথে শম্পা আমাকে এই মালাটা দিয়েছিল। তখন কলেজ-টলেজে পড়ি, সব সময় বুক ফুলিয়ে খুব একটা বীরত্বের ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতাম যদিও, কিন্তু মেয়েদের দেখলেই কাচুমাচু হয়ে যেতাম। শম্পা ছিল আমার বন্ধু বিমানের মাসতুতো বোন। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। একদিন সে কফি হাউসে ফস করে চেঁচিয়ে গান গেয়ে উঠে সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল।

শম্পাকে আমি মনে-মনে দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এমনিতে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কফি হাউসে-টাউসে ওর চারপাশে অনেক মৌমাছি গুনগুন করত—আমি বরাবরই বেশ লাজুক, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে কথা বলতে পারি না। দূর থেকে শম্পার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে কথা বলতাম।

নাইট শো-তে দল বেঁধে হ্যামলেট দেখতে গিয়েছিলাম, টিকিট কেটেছিল বিমান, শম্পাও যে যাবে আমি জানতাম না। অন্ধকারে ঢুকে একেবারে শম্পার পাশে বসে পড়ার পর একটা চাপা আনন্দে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম। শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল, অন্ধকারের মধ্যেও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ।

—শম্পা, তুমি আসবে, জানতাম না তো!

—স স্ স, বই আরম্ভ হয়ে গেছে—

আমি মনে-মনে বললাম, সত্যি হোরেশিও, স্বর্গ এবং পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা তোমার দর্শনে কল্পনাও করতে পারোনি। কল্পনা করতে পেরেছিলে, আজ রাত নটায় তুমি শম্পার পাশে বসার দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়ে যাবে! কী অপরূপ গন্ধ আসছে শম্পার শরীর থেকে! মনে হচ্ছে, আমি যেন চেয়ারে বসে নেই, একটা ঝর্নার পাশে শুয়ে আছি।

শো ভাঙবার পর বেরিয়ে ট্যাকসি খোজাখুজি করছি—আমরা দু-তিনজন যাব উত্তরে, শম্পা আর বিমান যাবে দক্ষিণে। এক্ষুনি আমরা আলাদা হয়ে যাব—তার আগে আমরা দ্রুত আলোচনা সেরে নিচ্ছি, কার কেমন লেগেছে ছবিটা। আমি চুপ করেই ছিলাম। শম্পা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু বলছেন না যে? আপনার ভালো লাগেনি?

আমি হঠাৎ অতিরিক্ত স্মার্ট হয়ে গিয়ে বললাম, আমি তো ছবিটা মন দিয়ে দেখতেই পারিনি! দেখব কী, তোমার সারা গা দিয়ে এমন সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল—

শম্পা খিলখিল করে হাসতে-হাসতে বলল, সারা গা দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে? ওমা, সে কী!

—হ্যাঁ, সত্যি, একটা খুব সুন্দর গন্ধ! আগে কখনো এরকম গন্ধ কোন মেয়ের গা থেকে পাইনি!

শম্পার খোঁপায় যে মালা জড়ানো ছিল, আমি লক্ষ করিনি। শম্পা চুলে হাত দিয়ে একছড়া যুঁই ফুলের মালা খুলে এনে বলল, এইটা? এর গন্ধটা খুব ভালো লাগল আপনার? আগে কখনো যুঁই ফুলের গন্ধ শোঁকেননি?

অনেক ছেলে মেয়েদের সামনে বেশ টকাটক স্মার্ট কথা বলে যায়, কোনকিছুতে ভুল হয় না। আমার পক্ষে লাজুকতাই ভালো দেখছি, হঠাৎ একটা কিছু বলে ফেলেও আর তাল সামলাতে পারি না। সত্যিই তো যুঁই ফুলের গন্ধ কী আমার চেনা উচিত ছিল না!

ট্যাকসির জানলায় শম্পার মুখ, ওদের ট্যাকসিটা তখন ছেড়ে দিয়েছে। শম্পা ইয়ার্কি করে বলল, এই নিন, মালাটা আপনিই নিয়ে যান। সারা রাত ধরে শুঁকবেন।

সত্যি-সত্যি মালাটা আমার হাতে দিয়ে গেল, ওদের ট্যাকসি চলে গেছে। মালাটা হাতে নিয়ে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বন্ধুরা তো একচোট ঠাট্টা যা করার তা করলই, কিন্তু সমস্যা হলো বাড়ি পৌঁছে। মালাটা নিয়ে আমি করব কী? রাত বারোটার সময় আমি একটা যুঁই

ফুলের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরছি—এ দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। আমাদের বাড়িতে তখন খুব কড়া শাসন। কোন মেয়ে চিঠি লিখতে চাইলে বাড়ির ঠিকানা না-দিয়ে এক বন্ধুর ঠিকানা দিতাম। সেই আমি যুই ফুলের মালা নিয়ে মাঝরাতে...

অথচ মালাটা ফেলে দিতে একটুও ইচ্ছে করল না। শম্পা তার খোঁপা থেকে মালাটা খুলে দিয়েছে, সেটা আমি রাস্তার ধুলোবালির মধ্যে ফেলে দেব—এ কখনো হতে পারে? এ শুধু শম্পাকে নয়, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে অপমান করা। তাছাড়া, আগেকার দিনে রানীরা যেমন কখনো কোন ভক্তের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে গলা থেকে বহুমূল্য হার খুলে দিতেন, আমার এটাও যেন সেই রকম উপহার।

মালাটা আমি পকেটে লুকিয়ে এনে বাড়িতে ফিরলাম। সারারাত সেটা মাথার পাশে নিয়ে জেগে থাকিনি ঠিকই, তবে ঘুমোতে যাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ সেটার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মনে হয়েছিল, আমি যেন শম্পার হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, শম্পা যেন আমার সামনেই বসে আছে।

মালাটা পরদিন সকালেও ফেলতে পারিনি কিছুতেই। মনের মধ্যে এই কথাটাই বারবার আসছিল, মুক্তোর মালা হলে যত্ন করে রেখে দিতাম আর ফুলের মালা বলেই ফেলে দেব? ফুল কী মুক্তোর চেয়ে কম দামি? (বাইশ-তেইশবছর বয়সেই শুধু এই ধরনের চমকপ্রদ কথা মনে আসে।) মালাটা আমি নিজস্ব সুটকেসের একেবারে তলায়, কাগজের ভাঁজে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

এক বছর দুবছর অন্তর সকলেই একবার করে সুটকেস কিংবা টেবিলের ড্রয়ার গুছোয়। কত চিঠি বা কাগজ—যা একসময় দারুণ দরকারি ছিল, এক বছর পর তার আর কোন মূল্যই থাকে না— মুড়ে-মুড়ে সেগুলো ফেলে দিই। মালাটা ফেলতে পারি না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেল, শম্পার জীবন আর আমার জীবন সম্পূর্ণ দুদিকে ঘুরে গেছে, তবু মালাটির বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারি না এখনো। সুটকেসের তলার কাগজ মাঝে-মাঝে বদলাতে হয়, মালাটা তখন ফেলে দিতে গিয়েও আবার নতুন কাগজের ভাঁজে রেখে দিই, আছে, থাক না!

শম্পার সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। তার চারপাশের উজ্জ্বল যুবকদের মধ্যে আমি পাত্তা পাইনি। তাছাড়া, শম্পার স্বভাব ছিল—একজন কারুর সঙ্গে নিভৃতে গল্প করার বদলে, বেশ কয়েকজন স্তাবক-ঘেরাও অবস্থায় থাকা। তার পর দুম করে একদিন শম্পার বিয়ে হয়ে গেল শান্তনুর সঙ্গে—এলাহাবাদে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। শম্পাকে কোনদিন আমি চিঠিপত্র লিখিনি, শম্পা হয়তো আমার কথা মনেও রাখেনি।

তিন-চারবছর বাদেই শুনলাম শম্পা সিনেমায় নামছে—তাও বাংলায় নয়,

এক লাফে হিন্দিতে। দু-একখানা ফিল্ম ম্যাগাজিনে ওর ছবিটবিও দেখা গেল, তবে ফিল্মটা শেষ পর্যন্ত রিলিজড হয়নি। শম্পার সিনেমায় নামার খবরে আমরা খুব ছি-ছি করেছিলাম। যদিও আমরা সিনেমাকে এখন আর্ট বলে মনে করি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই শিল্পী—তবুও চেনাশুনো মেয়েদের ফিল্মে অভিনয় করা আমরা অনেকেই পছন্দ করি না। পছন্দ করি না, আবার লোকজনের কাছে একথা বলার লোভও সম্বরণ করতে পারি না যে, ঐ যে অমুক বইতে নায়িকার পার্ট করেছে, ওকে তো আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। এখনো ওর সঙ্গে দেখা হলে...

হিন্দি ফিল্মে ব্যর্থ হয়ে শম্পা চলে এল কলকাতায়, একটা বাংলা ফিল্মে সুযোগও পেয়ে গেল। শুনলাম, শান্তনুর সঙ্গে শম্পার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, শান্তনু একা-একা চলে গেছে বিলেতে। আমরা এজন্য শম্পা সম্পর্কে যুগপৎ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলাম—ওর সম্পর্কে রীতিমতন আপত্তিকর গুজব শোনা যেতে লাগল। বিমান তো আর শম্পার নাম মুখেও আনে না।

শম্পা যে-ছবির নায়িকা, সে ছবি মুক্তি পাবার পর দুসপ্তাহও চলল না, দর্শকরা টিকিটের দাম ফেরত চেয়ে চেয়ার-টেবিল ভাঙল। শম্পা দেখতে খুবই সুন্দরী-সপ্রতিভ-চালাক-চতুর মেয়ে—ফিল্মে তার সার্থক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ছবিতে দেখলাম তার অভিনয় পুতুলের মতন কাঠ-কাঠ। শম্পা সম্পর্কে আমরা নিস্পৃহ হয়ে গেলাম। অবশ্য সে যদি দারুণ জনপ্রিয় নায়িকা হতো, এরকম নিস্পৃহ হতে পারতাম কিনা সন্দেহ। শম্পা আরো চার-পাঁচটা ফিল্মে ছোটখাটো পার্ট করল, তারপর একেবারে হারিয়ে গেল। কানাঘুষোয় শুনতাম, শম্পা এখন অফিসের থিয়েটারে 'অ্যামেচার অ্যাকট্রেস'।

দিন দশেক আগে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটা চীনে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, শম্পা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দুজন কমীরধরনের চেহারার লোকের সঙ্গে নামছে। তার পোশাক ও পদক্ষেপ অসংযত। পাছে শম্পা আমায় চিনতে পারে কিংবা ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়—এইজন্য আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

শম্পার কোন মূল্যই নেই আমার কাছে, তবু সেই মালাটা আমি রেখে দিয়েছি কেন? ঐ মালাটা কোন মেয়ের স্মৃতি নয় আমার কাছে। সেই একটি রাত্রির সৌন্দর্য, চেনা ফুলের রহস্যময় সৌরভ আর ছেলেমানুষের মোহময় ভালোলাগা—যা আর কোনদিন ফিরে পাব না, এটা তার স্মৃতি।

১৫

ড্রয়ারের কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ নন্দিতার ঠিকানা পেয়ে গেলাম। রেলের ডাইনিং কারের খাবার স্লিপে ঠিকানাটা লেখা। কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমে ভাবতে হলো, কে এই নন্দিতা অধিকারী? আমার স্মৃতির কোন অংশের অধিকারিণী? এক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য মনে পড়ল নন্দিতার পুরো চেহারা, রহস্যময় হাসিসমেত তার ঝলমলে মুখ।

একবার ভাবলাম, ঠিকানা-লেখা কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেব। কিন্তু ফেলা হলো না—হঠাৎ আমার মনে হলো, এইটাই তো নন্দিতার সঙ্গে দেখা করার সময়!

নন্দিতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দুবছর আগে, ট্রেনের কামরায়। রাজধানী এক্সপ্রেসে নয়, যে ট্রেন কলকাতা থেকে দিল্লিতে সাইত্রিশ ঘণ্টায় পৌঁছোবার কথা—কিন্তু চল্লিশ ঘণ্টার আগে পৌঁছোয় না—সেই ট্রেনে। আপদ বিপদের সময় খুব অল্প কারণেই ঘন বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সেবার মোগলসরাই-এর কাছে আমাদের ট্রেনে দুটি কামরায় আগুন লেগে গিয়েছিল, আমাদের কামরায় নয়, আমাদের পাশের কামরায়—কিন্তু আমাদের এখানকার নারী-যাত্রিণীরা দারুণ ত্রাস্ত হয়ে ওঠে।

মাঝপথে ট্রেন থেমে গিয়ে আমাদের পাশের কামরা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কী ব্যাপার বোঝার আগেই সবাই চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি করতে লাগল। নন্দিতা বসেছিল আমার পাশে—তার মুখখানা বিবর্ণ, বক্তহীন। তারপর যখন ধোঁয়ার হলকা আমাদের কামরাতেও ঢোকে, সে তখন পাগলের মতন দরজা খুলে লাফ দিতে চায়—আমি ওর হাত চেপে না-ধরলে পড়েই যেত। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল ন্যাকামি। পরে আমাকে নন্দিতা বলল, আগুন সম্পর্কে ওর দারুণ ভয়। আগুন দেখলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়।

সেই থেকে আলাপ। নন্দিতা তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছিল। সেই বান্ধবী তার নাম-ঠিকানা লিখে দেয়নি, সুতরাং নাম ভুলে গেছি। চেহারাও মনে আছে অস্পষ্ট। দিল্লিতে ওরা উঠেছিল চাণক্যপুরীতে, আমি ডিফেন্স কলোনিতে। বারবার বলে দিয়েছিল দিল্লিতে দেখা করতে। আমি অবশ্য দেখা করিনি। ট্রেনে আলাপ ট্রেনেই বেশি জমে, পরে তেমন জমে না। বন্যার সময় মানুষে-মানুষে যেরকম আত্মীয়তা হয়, অন্য কোন সময় সেরকম হয় না।

তবুও অবশ্য নন্দিতা আর তার বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লিতে দু-একবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে বেড়াতে গেলে—কে কোথায় যাবে, তা তো

বাঁধাধরা। কুতুবমিনার কিংবা লালকেল্লায়, সে এ লুমিয়ের (নাকি সন-এ লুমিয়ের—কী জানি কী উচ্চারণ, তার চেয়ে বাংলায় 'শব্দ ও আলো' বলাই ভালো) —এসব জায়গায় দেখা হবেই। দেখা হয়েছে, কিন্তু বেশি কথা হয়নি। তবে, প্রত্যেকবারই নন্দিতা বলেছে, কলকাতায় ফিরে দেখা করবেন কিন্তু। আমার চেহারার মধ্যে একটা গোবেচারা ভাব আছে বলে অনেকেই আমাকে দয়া করতে চায়।

দুবছর কেটে গেছে, নন্দিতার সঙ্গে আমি দেখা করিনি। বস্তুত, নন্দিতার ঠিকানাটা আমার কাছে ছিল কিনা তাও মনে ছিল না। জামার পকেট থেকে কাগজপত্র সব ড্রয়ারে জমা করে দিই—তারপর এক বছর-দুবছর অন্তর ড্রয়ার পরিষ্কার করি। তবে, ঠিকানার জন্য শুধু নয়, এমনিই আমি দেখা করার জন্য তেমন উৎসাহ বোধ করিনি। দার্জিলিং-এর গোলাপ ফুল কলকাতায় এনে শুকলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

কিন্তু এখন হঠাৎ নন্দিতার ঠিকানাটা খুঁজে পেয়ে মনে হলো, একবার দেখা করা যাক না! এই তো সময়!

ঠিকানা খুঁজে পেতে বেশ অসুবিধে হলো। কারণ নন্দিতার হাতের লেখা সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম, ঐ নম্বরের ঐ রাস্তায় কোন বাড়ি নেই। এক বছর আগে ঐ রাস্তার সব বাড়ির নম্বর অদল বদল করা হয়েছে। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল, নন্দিতা আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। দুবছর আগে সামান্য আলাপ, এতদিন দেখা করিনি, এখন হঠাৎ ঠিকানা খোঁজার সত্যিই হয়তো কোন মানে হয় না। কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে এক ট্রেনের কামরায় পাশাপাশি চল্লিশ ঘণ্টা বসেছিলাম—আর কোন মেয়ের সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ কী একসঙ্গে থেকেছি! আমি নির্লজ্জের মতন ঠিক খুঁজে বার করলাম ওদের বাড়ি।

আমার সঙ্গে আলাপের সময় নন্দিতা ছিল কুমারী, এখন তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। তখন সে বি. এ পরীক্ষা দিয়েছিল, এম. এ পড়ার আগেই প্রেমে পড়া কি অসম্ভব?

বেশ বড় বাড়ি ওদের। একজন বাক্তিত্বসম্পন্ন প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই? আমি নির্ভয়ে নন্দিতার নাম বললাম। তিনি আর জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কোথা থেকে আসছি, বা আমার কী দরকার। বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হলো আমায়। বসে-বসে ভাবছি, এতদিন বাদে নন্দিতা আমাকে চিনতে পারবে কিনা! ও ঘরে ঢুকলেই আমি বলব, চিনতে পারেন? তারপরও যদি নন্দিতা আমাকে চিনতে না-পারে, তখন আমি কী করব? সবিস্তারে বলব সেই ট্রেনের ঘটনা, দিল্লি যাবার পথে চল্লিশ

ঘণ্টা—সেই কামরায় আগুন লাগা ও চেঁচামেচি—তাও যদি ওর মনে না-পড়ে? যদি ওর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়? মেয়েদের স্মৃতিশক্তি সাধারণত খারাপ হয় না —কিন্তু যদি ইচ্ছে করে মনে করতে না-চায়? তাহলে কী ওর বাড়ির লোক আমাকে চ্যাংড়া ছোঁড়া ভাববে না কি?

আমি এতদিন বাদে এসেছি কেন ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য? ট্রেনে সেই ঘটনার পর নন্দিতা আমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। আমি এসেছি আজ সেই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান নিতে। আমি নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করব, এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছে। যেখানেই যাবার কথা থাক, আমি বলব, ওকে যেতে হবে না। আমি এবার পুজোয় কোথাও যাচ্ছি না—আমার চেনাশুনো কেউ যাক, তা-ও চাই না। আর কিছু না, পুজোর সময় আমার সঙ্গে কলকাতায় যে বেড়াতে যেতে হবে, তা-ও নয়।

দরজার পাশে দু-একজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন ঘরে ঢুকতে চাইছে না, কে যেন বলছে, যা না, যা—। তারপর আস্তে-আস্তে একটি মেয়ে এসে ঢুকল ঘরে। নন্দিতার মতনই হাঁটার ভঙ্গি, তার মতনই উচ্চতা। কিন্তু এই মেয়েটি কে?

মেয়েটির মুখের একটা পাশ পুড়ে ঝলসে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে মুখের একপাশের চামড়া, তাকালে গা শিরশির করে।

আমি কিছু বলার আগে সে-ই বলল, চিনতে পারছেন? স্পষ্ট নন্দিতার গলা। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। শুকনোভাবে বললাম হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

আমার সন্দেহ ছিল নন্দিতা আমাকে চিনতে পারবে কিনা, অথচ আমিই তাকে প্রথমটা চিনতে পারিনি।

নন্দিতা বলল, আপনি এতদিনে একবারও এলেন না—

আমি নিচু গলায় বললাম, কবে হলো?

—গত বছর...জনতা স্টোভ নেভাতে গিয়ে...আপনি আর এলেন না—

নন্দিতা দুবার 'আপনি আর এলেন না' বলায় মনে হলো, ও বোধহয় বলতে চাইছে, সত্যিই যখন ওর আগুন লাগল তখন আমি কোন সাহায্য করতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এবার কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, শিলং যাবার কথা—

এবার আমি খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, বাঃ, শিলং খুব ভালো জায়গা। আমিও হয়তো ওখানেই যাব। দেখা হবে।

১৬

আমার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই একটা নার্সিং হোম, হিরণ্ময়ের স্ত্রী কাজল সেখানে ভর্তি হয়েছে প্রায় দিন দশেক আগে। ডিউ ডেট পেরিয়ে গেছে, দশদিন আগে সেই যে কাজলের একবার ব্যথা উঠেছিল, তারপর ব্যথা ট্যথা কোথায় মিলিয়ে গেছে, এখন সে বেশ হাসিখুশি মুখে জানলায় বসে থাকে। হিরণ্ময়ের খুব মুস্কিল, ইয়ার ক্লোজিং-এর সময় অফিসে খুব কাজ, পাটনায় জরুরি কনফারেন্স আছে, জন্মক্ষণেই প্রথম সন্তানের মুখ দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারল না, পাটনায় চলে গেল। আমাকে বলে গেল, একটু খোঁজখবর নিস, বাড়ির পাশেই তো—। যদিও কাজলের বাপের বাড়ির লোক দুবেলা আসে, দুপুরে কিংবা মাঝরাত্তিরে ব্যথা উঠলেও খবর জানানোর জন্য টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে, তবু যেহেতু নার্সিং হোমের পাশেই আমার বাড়ি—সুতরাং আমার ওপর একটা দায়িত্ব এসেই যায়।

হাসপাতাল আমার সহ্য হয় না। পারতপক্ষে ওর থেকে দূরে থাকি, আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে ভর্তি হলেও কক্ষনো দেখা করতে যাই না। হাসপাতালে ঢুকলেই যে গন্ধ নাকে আসে, ঠিক ডেটলের গন্ধ বলা যায় না—বলা যায় অসুখের গন্ধ, সেটা আমি ঠিক সইতে পারি না। তবে নার্সিং হোমে অতটা মনে হয় না, তাছাড়া কাজলের তো অসুখ করেনি! সুতরাং কাজলের মন প্রফুল্ল রাখার জন্য যখন-তখন ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসি। অনেক সময় কাজল জানলা দিয়ে আমাকে ডেকে গল্পের বই চায়।

সাত বছর আগে বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম সন্তান হবে। সন্তানের জন্য হিরণ্ময় আর কাজল দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সারা দেশে বেশি ছেলেপুলে জন্মাচ্ছে বলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর এত ঢাক-ঢোল, অথচ ওদের একটিমাত্র সন্তানও হলো না, এ কী অবিচার! ডাক্তারী পরীক্ষা, জ্যোতিষী, নয়ানপুরের অলৌকিক শক্তিধর সাধুবাবুকে দেখানো—সবই হয়ে গেছে, এমনকী হিরণ্ময়ের মতন সপ্রতিভ বুদ্ধিমান ছেলে গোপনে তাবিজ-মাদুলি ধারণ করেছে কিনা তারও ঠিক নেই। যাই হোক, এতদিন বাদে—। আমি কাজলকে ঠাট্টা করে বললাম, তোমার বোধ হয় যমজ সন্তান হবে, তাই এত দেরি হচ্ছে! কাজল ছদ্মকোপে তর্জনী তুলে আমাকে বলে, এই, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

লোহার খাটে চাদর গায়ে শুয়ে কাজল, তাকে একটুও অসুস্থ দেখায় না, গালদুটিতে স্বাস্থ্যের আভা, মাথার কোঁকড়া চুল কী গভীর কালো। হাসির কথা শুনলে হাসতে-হাসতে সারা শরীর কাঁপায়। তবে ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠা সে চাপতে পারছে না। আশেপাশের ক্যাবিনের

অন্য-অন্য বউদের টপাটপ বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে, চার-পাঁচদিন বাদে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা। কাজল তার পেটের মধ্যে সন্তান নড়াচড়া টের পায়। কিন্তু এখনো সেই সন্তান পৃথিবীর আলো দেখতে চাইছে না।

আরো একটু লক্ষ করে বুঝতে পারলাম, কাজলের উত্তেজনার আর একটি কারণ আছে। দু-এক বছর ধরে কাজল খুব অসুখী ছিল—কারণ হিরণ্ময় বিশ্বাস করত যে কাজলের সন্তানধারণের ক্ষমতা নেই। স্পষ্ট করে না-বললেও হিরণ্ময়ের ভাবভঙ্গিতে এই কথাটা প্রকাশ পেত। বুদ্ধিমতী মেয়ে কাজল, সেটা বুঝতে পেরে আঘাত পেয়েছিল খুব। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলেছে, সাত বছর বাদে কাজল তার শরীরে দ্বিতীয় আত্মা ধারণ করেছে। পেটের মধ্যে নড়ছে সেই বাচ্চা, কতক্ষণে তার মুখ দেখবে, কাজলের সেই প্রতীক্ষা।

—ছেলে-না-মেয়ে, তোমার কী শখ?

কাজল হাসতে-হাসতে বলল, আমি আগে থেকে কিছু ভাবিনি। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক—

—তবু, মনে-মনে ইচ্ছা একটা নিশ্চয়ই আছে। সবারই থাকে।

—মেয়ে। আমি মেয়ে চাই, বেশ সাজাব-গোজাব।

—বুঝতে পেরেছি। সাধারণত যেটা আশা করা যায়, তার উল্টো হয় তো, তাই তুমি মেয়ে আশা করছ। আসলে সবার মতন তোমারও ছেলের শখ।

—মোটেই না!

রোজ রাত্তিরে পাটনা থেকে ট্রাঙ্ককল করে হিরণ্ময় রোজই হতাশ হয়। নার্সিং হোমের আরামে থেকে কাজলের চেহারা আরো ভালো হয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের বাড়িতে থাকে বাদল, বেশ কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, হঠাৎ সকালবেলা ডেকে বলল, আর সাতদিন পরেই ও বিয়ে করছে। হাতে একেবারে ছাপানো নেমন্তন্নর চিঠি।

একটু অবাক হয়েছিলাম। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, সব মিটমাট হয়ে গেল কী করে?

বাদল বিগলিত মুখে বলল, মাকে সব খুলে বললাম, বুঝলি না, মা কী আর শেষ পর্যন্ত রাগ করে থাকতে পারে!

—কীরকম বিয়ে হচ্ছে? ম্যারাপ ট্যারাপ বেঁধে? লুচি টুচি সব হবে?

—হ্যাঁ, মায়ের তাই ইচ্ছে। এ সিজনে এটাই শেষ তারিখ, তাই একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে।

—ঠিক আছে, আমার তিরিশ টাকা ধার শোধ করে দিস এবার। অনেকদিন হয়ে গেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেব, দেব, নিশ্চয়ই দেব। শোন তোকে কিন্তু ভাই বিয়ের দিন একটু দেখাশুনো করতে হবে। ওদের বাড়ির লোকজনকে তো তুই চিনিস।

—সে দেখব এখন! আমার এক বন্ধুর স্ত্রী আবার এই নার্সিং হোমে, তার যদি সেদিনই কিছু হয়—

অনীতার সঙ্গে বাদলের ছবছর ধরে চেনাশুনো—কিন্তু অনীতার সঙ্গে বাদলের বিয়ের প্রস্তাবে বাদলের বাবা-মা কিছুতেই রাজি নয়। মন কষাকষি, রাগারাগি থেকে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। ওদের জেদও বেড়ে গেল। অবশ্য রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা থাকার সাহসও নেই বাদলের। অনেকে বাদলকে বুদ্ধি দিল, অনীতার সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেলতে—একবার বিয়ে হয়ে গেলে বাবা-মায়েরা শেষ পর্যন্ত মেনেই নেয়।

বাদল আর অনীতার রেজিস্ট্রি বিয়েতে আমি ছিলাম একজন সাক্ষি—ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে দেবার টাকা আমার কাছ থেকেই ধার নিয়েছিল বাদল। কিন্তু এমন ছেলে যে, রেজিস্ট্রি হবার ছমাসের মধ্যেও বাড়িতে বলতে সাহস পেল না। ওদিকে অনীতার বাড়ি থেকে নানা কথা বলছে, শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপর রাগ করে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতাম না। যাক, শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হয়ে গেল—এখন বাড়ির সুপুত্র হয়ে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করবে, দু-তিনবছরের মধ্যেই অনীতার সঙ্গে রীতিমতন ঝগড়া করবে।

বাদলের যেদিন বিয়ে, ঠিক সেদিনই সকালে কাজলের প্রসব হয়ে গেল। সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, কাজলের একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। সকালবেলা আমাকেই প্রথম খবর দেয় নার্সিং হোম থেকে, আমি কাজলের বাপের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে হিরণ্ময়কে ট্রাঙ্ককল করলাম। সবই নির্বিঘ্নে হয়ে গেল, বিকেলের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে কাজলের, এখন তার মুখে সেই হাসির লেখা—যার বর্ণনা হয় না।

সন্ধেবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। এখান থেকে উল্টোদিকের নার্সিং হোমে কাজলের ঘরটা দেখা যায়। জানলার পর্দা তুলে দিয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ঘর ভর্তি কাজলের আত্মীয়স্বজন, নার্স কোলে করে এসে বাচ্চাটাকে দেখাল—কাজল উঠে বসার চেষ্টা করল একবার।

পাশের বাড়ির ব্যালকনি থেকে বাদল আমাকে ডেকে বলল, এই, তুই কখন আসবি? সাড়ে সাতটার মধ্যে কিন্তু বেরুতে হবে, তুই যাবি আমার গাড়িতে—

বাদলকে আমি কিছু বলবার আগেই নিচে রাস্তায় ধ্বনি উঠল, বল হরি, হরি বোল—! বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—আমাদের পাড়ার এম. এল.

এ. দীনবন্ধুবাবুর মৃতদেহ। বিপুল ভোটে ইলেকশানে জিতেছিলেন দীনবন্ধুবাবু, নির্ঘাৎ মন্ত্রী হতেন—কিন্তু রেজাল্ট বেরুবার পরের দিনই স্ট্রোক হল। প্রায় দেড় মাস জীবন্মৃত ছিলেন, এখন আমি বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর ফুলমালার মধ্যে শয়ান তাঁর হা-করা বিবর্ণ মুখ। একটা নীল মাছি উড়ছে চোখের ওপরে। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পাশের বারান্দা ও সামনের নার্সিং হোমের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আমি অকারণে একবার হাসলাম।

হঠাৎ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। এ তো একই সঙ্গে আমি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—জীবনের এই প্রধান তিনটে দৃশ্য দেখছি। পাশের বাড়িতে বাদল, সামনের বাড়িতে কাজলের হাসিমাখা মুখ, নিচে দীনবন্ধুবাবুর শব—এই ত্রয়ী দৃশ্যে আমার কোন দার্শনিক চিন্তা আসা উচিত ছিল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। যাঃ বাবা, এর মধ্যে হাসির কী আছে!

মানুষের ধারণা, সে তার নিজের সব ব্যবহারের মানে বোঝে। কিন্তু সেই তিন দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেন আমার হাসি পেল, তার কারণ আমি কিছুই জানি না।

১৭

বিমান আমাকে বলল, টেলিফোন অফিসে তোর কেউ চেনাশুনো আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, একজন অপারেটরকে চিনি। বহুকাল আগে যখন ডায়াল সিস্টেম হয়নি, তখন একজন অপারেটরের সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির গলার আওয়াজটা ভারী মিষ্টি, ঝগড়া করলেও শুনতে ভালো লাগে। সেই মেয়েটি এখনো আমাকে মাঝে-মাঝে অফিসে টেলিফোনে ডেকে আড্ডা দেয়। তবে তাকে আমি চোখেও দেখিনি, সেও আমাকে দেখেনি।

বিমান বলল, না, অপারেটর চেনা থাকলে হবে না। কর্তাব্যক্তিদের কেউ চেনা নেই?

—পাগল! বড়বড় লোকেদের সঙ্গে আমার মতন চুনোপুঁটির কী করে চেনা থাকবে! কেন বল তো?

—বাড়িতে একটা টেলিফোন নেওয়া বিষম দরকার। বাবার হার্টের অসুখ, হঠাৎ মাঝরাত্তিরে শরীর খারাপ হলে—শুনেছি ভেতরে চেনাশুনো লোককে ধরতে পারলে অনেক সময় পাওয়া যায়। দেখি হীরেনদাকে বলে। হীরেনদার তো অনেকরকম কানেকশানস আছে।

—ঠিক আছে, যদি পাস তো আমাকেও একটা খবর দিস। আমার খুব শখ হয় বাড়িতে একটা টেলিফোন নেবার—

সুকান্ত একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করল, ইলেকট্রিক কোম্পানির হেড অফিসে তোর জানাশুনো কেউ কাজ করে নাকি রে?

—না তো। কেন?

—বাড়িতে একটা সাব-মিটার আনতে হবে।

—এর জন্য চেনাশুনো থাকার কী দরকার? কোম্পানিতে টাকা জমা দিবি, তারপর কোম্পানির লোক এসে মিটার বসিয়ে যাবে। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এর মধ্যে ধরাধরির কী আছে?

—তুই জানিস না। রেগুলার কোর্সে হলে টাকা জমা দেবার ক'মাস বাদে যে পাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের বাড়িতে মিটার নেবার সময় কী হলো জানিস না! টাকা জমা দিয়ে তো বসে আছি, সপ্তাহ দুয়েক বাদে চিঠি এল, অমুক দিন সকাল ঠিক পৌনে দশটার সময় কোম্পানির লোক যাবে লাইন ইন্সপেকশনে —সেই লোক যাতে ফিরে না-যায়, তুমি বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। রইলাম। লোক এল না, আমার অফিসের দেরি হয়ে গেল। আবার এল ঐরকম চিঠি, অমুক তারিখে ঠিক নটা বাহান্নর সময় কোম্পানির লোক যাবে—। সে-ও এল না। পর-পর চারখানা চিঠি আসার পর পঞ্চমবারে চিঠি না-দিয়ে লোক এসে ঘুরে গেল, তখন আমি অফিসে।

—যাঃ! আমি তো শুনেছি, বাদলদা টাকা জমা দিয়েই সপ্তাহখানেকের মধ্যে মিটার পেয়ে গেছে।

—কারুকে ধরেছিল নিশ্চয়ই।

—কারুকে ধরেনি!

—তাহলে সেটা অবিশ্বাস্যরকমের ব্যতিক্রম। সব ব্যাপারেই তো ব্যতিক্রম থাকে। ঠিক আছে, আমি টাকা জমা দিচ্ছি। যদি এক মাসের মধ্যেও পাই, তোকে জানিয়ে যাব—

নীতা বউদি বললেন, ইউনাইটেড মিশনারি স্কুলে তোমার কেউ জানাশুনো আছে?

—না তো! স্কুলটা কোথায়, তাই জানি না!

—সার্কুলার রোডে, বিরাট স্কুল।

—সেখানে চেনাশুনো দিয়ে কী হবে? তুমি কী স্কুলে চাকরি করবে নাকি?

—চাকরি কী রে! ছেলেটাকে ভর্তি করাবো!

—স্কুলে ভর্তি করতেও চেনাশুনো লাগে?

—তুই কিছু খবর রাখিস না। ভালো স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করা কী ঝকমারি—

—তোমার ছেলে তো খুব স্মার্ট। ওকে নিয়ে যাও, নিশ্চয়ই একটা কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা নেবে—তোমার ছেলে ঠিক পাস করে যাবে।

—পরীক্ষা তো দূরের কথা, ফর্মই দেবে না। জানুয়ারিতে সেশান, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নাকি—। নামটাম লিখে রাখা সব শেষ। আর নেবে না। আমি কী ছাই অত জানি, আমি ভেবেছি স্কুল খোলার আগে ভর্তি হলেই হবে! তাই আমার দেরি হয়ে গেছে—

—তা ঐ স্কুলেই দিতে হবে, এমন কী কথা আছে? অমুক স্কুলে দাওনা—সেও তো খুব ভালো স্কুল শুনেছি—

—ওরেব্বাবা! ওরা আরো কড়া। এখানে তবু শুনেছি, কোন টিচারকে ধরলে টরলে হয়। ঐ স্কুলটায় কোন মিনিস্টারের অনুরোধও গ্রাহ্য করে না।

মিনিস্টারের নামে আর-একটা গল্প মনে পড়ল।

কোন-এক আমলে কোন-এক মিনিস্টার একই সঙ্গে খুব সদাশয় আর চালাক ছিলেন। সব মিনিস্টারের কাছেই বহু কৃপাপ্রার্থী আসে। অমুক লাইসেন্স, অমুক পারমিট, অমুক জায়গায় সরকারি ফ্ল্যাট ইত্যাদি নানারকমের আবদার। নিজের কনস্টিটিউয়েন্সির বিশেষ লোকদের এরকম আবদার সহ্য করেননা—এমন মিনিস্টার ভূভারতে ক'জন আছেন কে জানে! যাই হোক, আমাদের গল্পের এই মিনিস্টার মহোদয়ের কাছে এইরকম প্রার্থীর সংখ্যা একটু বেশিই ছিল। তিনি একটা বুদ্ধি বার করেছিলেন। তিনি সব আবেদনপত্রের ওপরই সুপারিশ লিখে দিতেন। দিয়ে বলতেন, আমি তো লিখে দিচ্ছি বাপু, কিন্তু যে ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছো, সেখানকার লোকরা যদি তোমার আবেদন ন্যায্য মনে করে দেবে, না-হলে দেবে না—সে বিষয়ে আর আমি কিছু করতে পারব না।

আসলে মিনিস্টারের টেবিলে একটা মোটা পেন্সিল থাকত, তার একদিকটা নীল, অন্য দিকটা লাল। সব বিভাগে তাঁর নির্দেশ দেওয়া ছিল, নীল রঙের লেখা সুপারিশ দেখলেই অগ্রাহ্য করতে হবে, আর লাল রঙের সুপারিশ ভেরি-ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লোক বুঝে লাল-নীলের ব্যবহার।

একদিন হয়েছে কী, মিনিস্টারের ভাগনে, যে নিজেও ভবিষ্যতে মিনিস্টার হতে চায়—এবং তখন সুপারিশ কীভাবে লিখতে হবে তার হাতমক্স করার জন্য, লাল-নীল পেন্সিলটা চুরি করে নিয়ে গেল। কাজের সময় মিনিস্টার সেটা খুঁজে পেলেন না—প্রার্থীর সামনে রাগারাগিও করতে পারেন না, হাসিমুখে থাকতে হয় —তাই অগত্যা ফাউন্টেন পেন দিয়েই দুলাইন লিখে দিলেন।

বিভাগীয় কেরানিটি তো সেটা পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা। পেনের কালি সম্পর্কে তো কোন নির্দেশ নেই! ফেরাতেও সাহস হয় না, আবার এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মিনিস্টারকে বিব্রত করতেও সাহস হয় না। তিনি তখন গেলেন তাঁর বিভাগীয় বড় অফিসারের কাছে। অফিসার ভুরু কুঁচকে বললেন, পেন দিয়ে লেখা? কী রঙের কালি?

—কালো স্যার। একেবারে জেটব্ল্যাক।

—কালো? তাহলে আর চিন্তা কী! দিয়ে দিন, দিয়ে দিন! সবই তো কালাকানুনের ব্যাপার, কালো রং সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আজকাল ঠাকুর-দেবতাদের খুব বাজার খারাপ। ওনাদের কাছে কেউ আর বিশেষ মানত করে না, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে না। এখন মন্ত্রী বা বড়বড় নেতা বা বড়বড় অফিসাররাই ঠাকুর-দেবতার আসন নিয়েছেন। আমাদের এই ধরাধরির ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। অনেক দিনের ট্রাডিশন।

প্রাইমারি শিক্ষকদের প্রধান দাবি মাইনে বাড়ানো নয়, ঠিক সময়ে মাইনে পাওয়া। লাখ কথা না-হলে যেমন বিয়ে হয় না, সেইরকম কয়েক লক্ষ বার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, মিথ্যে আশ্বাস, মাইল-মাইল লম্বা বক্তৃতা ও কুমীরকে হার মানানো সহানুভূতি ইত্যাদি শেষ না-হলে শিক্ষকদের মাইনে বাড়ে না। কিন্তু প্রত্যেক চাকুরিজীবীই যেমন মাসের প্রথম মাইনে পান, তেমনি শিক্ষকদেরও প্রতি মাসে মাইনে পাবার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু শিক্ষকদের মাইনের বেশি অংশই সরকারের কাছ থেকে আসে, সেইজন্য বহু স্কুলের শিক্ষক, বিশেষত দূর গ্রামাঞ্চলের, পাঁচ-ছমাসের আগে প্রাপ্য মাইনেটুকুও পান না।

এজন্য তো তাঁরা সরকারকে দায়ী করবেনই। কারণ, চাল-ডাল-তেল-নুন কিনতে গেলে, তারা তো আর পাঁচ-ছমাস বাদে দাম নেবার কথায় রাজি হবে না। কোন বাড়িওয়ালা ছমাস ভাড়া বাকি রাখে? শিক্ষক কি তাঁর ছেলেকে বলবেন, আজ মাছ খেতে চেও না, পাঁচ মাস বাদে মাইনে পেয়ে তোমাকে মাছ খাওয়াব! এজন্য সরকারের প্রতি শিক্ষক পরিবারের ক্রোধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। কাগজ খুললেই এরকম চিঠি চোখে পড়ে।

আসল ব্যাপারটা কী? মাইনে না-বাড়ানোর জন্য সরকারি নীতি দায়ী। কিন্তু যে-মাইনে ধার্য আছে, তা না-দেবার ক্ষমতা সরকারেরও নেই। মাইনে ঠিক সময়ে দেওয়া-না-দেওয়ার হর্তা কর্তা কয়েকটি অফিসের কয়েকজন কর্মচারী, যাঁরা এ-টেবিলে ও-টেবিলে ফাইল চালাচালির খেলা খেলতে খুব ভালোবাসেন, যাঁরা নিজেরাও নিজেদের মাইনে বাড়াবার সুখস্বপ্ন দেখছেন।

দোষ অবশ্য ঠিক ঐসব কর্মচারীদেরও নয়। দোষ এই প্রথার, ব্রিটিশ আমল

থেকে যা চলে আসছে, আজও বদলানো হয়নি। ব্রিটিশ আমলে, কোন একজন কর্মচারীর ওপর বিশ্বাস করে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতো না—দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হত পাঁচজনের ওপর, এক ফাইলে পাঁচজনের সই না-হলে চলত না। অর্থাৎ যে-প্রথা তৈরি হয়েছিল একটা দেশকে শোষণ করার জন্য, সেই প্রথাই চলছে একটি স্বাধীন দেশে। এখন অবশ্য আর দায়িত্ব ভাগাভাগির ব্যাপারও নেই। এখন একজনের দায়িত্ব আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। কোনরকমে একটা আপত্তি তুলে নোট দিয়ে ফাইলটা অন্য টেবিলে চাপিয়ে দিতে পারলেই কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

ধরা যাক, কোন মফস্বল স্কুলের সেক্রেটারি পাঁচ মাস তাঁর শিক্ষকদের মাইনে দিতে না-পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতায় চলে এসে ধরলেন একজন চেনা লোককে। তাঁর চেনা আবার আর-একজন ফাইল চালাচালির অন্যতম খেলোয়াড়। তাঁকে ধরে কাঁচুমাচু মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা বিষয়ক আলোচনা শেষ হলে দমবন্ধ অন্ধকার থেকে বন্দি ফাইলটি উদ্ধার করা হলো। জয় হলো ধরাধরির। টাকা স্যাংকশান হয়ে গেল। তখন, সেই মুহূর্তে কর্মচারীটিই স্বয়ং গভর্নমেন্ট বা স্বয়ং ভগবান।

১৮

হীরেনদার বড়ছেলে হিরণ্যাভর বয়েস এখন দশ বছর। ভারী নম্র আর লাজুক ছেলে, বড়রা যেখানে কথা বলে—সেখানে মোটেই আসে না। অঙ্ক আর ইংরেজিতে একটু কাচা, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মন।

খুব ছেলেবেলায় এই হিরণ্যাভ ছিল দারুণ প্রতিভাবান। তার যখন আড়াই বছর বয়েস, সে তখন 'টুইংকিল টুইংকিল লিটিল স্টার' পুরো মুখস্থ বলতে পারত। হীরেনদার বাড়িতে গেলেই নীতা বউদি ছেলেকে ডেকে এনে বলতেন, দাও তো, কাকুকে তোমার সেই ইংরেজি কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো! তক্ষুণি দম-লাগানো পুতুলের মতন সে হাত-পা ছুঁড়ে আরম্ভ করে দিত। বস্তুত, ঐ পদ্যটা আমাদের এতবার শুনতে হয়েছে হিরণ্যাভর মুখে যে আমাদেরই আবার নতুন করে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তিন বছর বয়েসে হিরণ্যাভ 'বন্দী বীর' পুরো আবৃত্তি করতে শেখে। নীতা বউদি আমাদের খুব পীড়াপীড়ি করতেন ওকে একদিন রেডিওর শিশুমহলে নিয়ে যাবার জন্য। নীতা বউদির ধারণা—ওরকম ছেলে আর ভূভারতে জন্মায়নি—এবং

আমরাও ঐ বয়েসে হিরণ্যাভর যেরকম প্রতিভার স্ফুরণ দেখেছিলাম, তাতে আমাদেরও মাঝে-মাঝে সন্দেহ হতো, ও ছেলে বড় হলে ডেপুটি হবেই।

যাই হোক, এ লেখা হিরণ্যাভ সম্পর্কে নয়। হিরণ্যাভর সেই অল্প বয়েসে, ও-বাড়িতে গেলেই নীতা বউদি আমাদের ধরে বেঁধে চা-ফা খাইয়ে তাঁর ছেলের নবনব প্রতিভার বিকাশ দেখতে বাধ্য করতেন, আর হীরেনদা মৃদু-মৃদু হাসতেন। একদিন অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হয়ে আমি আর বিমান বেরিয়ে এসে বাইরে প্রবল হাসতে লাগলাম। তারপর বিমানকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, হীরেনদার ব্যাপারটা কী বল তো? নীতা বউদি না হয় ছেলের জন্য ডগমগ, কিন্তু হীরেনদারও কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? বিমান বলল, আমরা যাতে বেশিক্ষণ বসে আড্ডা না-মারি, সেইজন্যই বোধহয় হীরেনদা ঐ ব্যাপারটার প্রশ্রয় দেয়।

হীরেনদাকে ঐ সম্পর্কে এরকম সন্দেহ করা যায় কিনা—এ ব্যাপারে আমরা ঠিক মনঃস্থির করতে পারিনি—তাই অনেক দিন আর হীরেনদার বাড়িতে যাইনি। ইদানীং হীরেনদা আমাদের আবার প্রায়ই ডাকাডাকি করেন, রাস্তায় দেখা হলেই বলেন, বাড়িতে আসিস না কেন আর? আড্ডা না-মারতে পারলে কারুর ভালো লাগে?

আগেই বলেছি, হিরণ্যাভর এখন দশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, লাজুক ও শান্ত, কাছে আসে না—এবং ছেলের কৃতিত্ব বিষয়ে গর্ব করার বদলে পড়াশুনোয় তার প্রতিভার অভাব বিষয়েই অনুযোগ শোনালেন নীতা বউদি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আশ্চর্য হলাম অন্য একটা ব্যাপার দেখে। ওঁদের আর-একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম অরুণাভ, বয়স পৌনে তিন। বেশ স্বাস্থ্যবান, দুরন্ত ছেলে, সারা ঘরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। অথচ তার সম্পর্কে একটাও কথা বললেন না নীতা বউদি। নীতা বউদির কি স্বভাব বদলে গেল? অথবা এ ছেলেটির কি কোনই প্রতিভা নেই? নিতান্ত টুইস্ট নাচ বা এক থেকে তিরিশ গোনা বা বড়মামা কী করে কথা বলে তা অনুকরণ করে দেখানোর ক্ষমতাও তার নেই? নীতা বউদি একেবারে নির্বিকার।

সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়েরা বেশি আতিশয্য দেখালে যেমন অন্যদের খারাপ লাগতে পারে, তেমনি ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কোনরকম উৎসাহ না-দেখালেও আবার অস্বস্তি বোধ হয়। কোন বাচ্চা ছেলের অস্বাভাবিক গুণপনা দেখলে যেমন একটু আনক্যানি লাগে, তেমনি আবার তাদের স্বাভাবিক দুষ্টুমি বা মজার ব্যাপারগুলো শুনতে বেশ ভালোই লাগে। বড়দের আড্ডায় ছোটদের উপস্থিতি বেশিক্ষণ ভালো লাগে না, কিন্তু কোন বাড়িতে প্রাণবন্ত বাচ্চা থাকলে তাদের সম্পর্কে নিরাসক্ত থাকাটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার। নীতা বউদি এ কী করছেন?

একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি করছিল অরুণাভ, আমি তাকে ধরে একটু আদর করতে গেলাম, সে কিছুতেই থাকবে না—ছটফট করে পালাল। আবার ঘুরে আসবার পর আমি তাকে খপ করে ধরে ফেললাম, বন্দি করে ফেললামই বলা যায়। তার রেশমের মতন সুন্দর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে নাম টাম জিজ্ঞেস করলাম, সে চটপট উত্তর দিয়ে দিল। নীতা বউদির দিকে তাকিয়ে নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ও কোন ছড়া টড়া শেখেনি?

নীতা বউদি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, না।

হীরেনদা এবার হাসতে-হাসতে বললেন, কেন, ও যা শিখেছে, তাই ওদের শুনিয়ে দাও না!

নীতা বউদি গোমড়ামুখে বললেন, থাক! আর শোনাতে হবে না, ওরা অনেক শুনেছে।

নিজেকে বেশ অপরাধী বোধ হতে লাগল—। নীতা বউদি কী বুঝে ফেলেছেন যে হিরণ্ময়ের বেলায় আমরা—। ঘটনাটা অবশ্য তা নয়, পরেই বুঝতে পারলাম।

হীরেনদা নিজেই উদ্যোগী হয়ে বললেন, শোননা, আমার ছেলে কী কী শিখেছে। পৌনে তিন বছর বয়েস, এর মধ্যেই একেবারে...। বুবুল, এদিকে এসো তো, কাকুদের শুনিয়ে দাও তো কাল রাত্তিরে যাদবপুরে কী হয়েছে?

আবৃত্তি করার ভঙ্গিতেই মুখ চোখ সীরিয়াস করে অরুণাভ বলল, কাল যাদবপুরে গুণ্ডারা বোমা ফাটিয়েছে!

—কীরকম করে বোমা ফাটে?

—বুম বাম, বুম ববাম, বুম ববাম--

—আচ্ছা! এবার বলো তো, বিবেকানন্দ রোডে কী হয়েছে?

—একটা বাস, আর একটা ট্রাম না, যাচ্ছিল তো, আর অমনি তাতে অনেক ছেলে এসে আগুন লাগিয়ে দিল! আর আগুন, আগুন না, এমন জ্বলতে লাগল যে, ধোঁয়া-ধোঁয়া-ধোঁয়া—আকাশ পর্যন্ত ধোঁয়া—আগুন জ্বলছে পিরি-পিরি-পিরি—

আগুন কেন পিরিভাবে জ্বলে সেটা অবশ্য ওরই আবিষ্কার, কিন্তু বাকি দৃশ্যবর্ণনায় কোন ভুল নেই। নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছে ঐ পৌনে তিন বছরের ছেলে।

হীরেনদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এবার বলো তো পুলিশ কী করে?

—পুলিস এইরকমভাবে গুলি! গুড়ুম-গুড়ুম—

একথা বলেই অরুণাভ তার খেলনা পিস্তলটা তুলে আমাদের সব্বাইকে গুলি করে দিল, এমনকী দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবিও বাদ রাখল না—তারপর

বারান্দা দিয়ে রাস্তার লোককে গুলি করতে গেল।

হীরেনদা হাসতে-হাসতে বললেন, আমার বড় ছেলেকে নীতা অনেক ছড়াটড়া শেখাত। আমার ছোট ছেলেকে এসব কিন্তু কেউ শেখায়নি।

নীতা বউদি বললেন, এসব আবার শেখাতে হয় নাকি!

হীরেনদা বললেন,—সবসময় শুনছে তো। ঝি-চাকররা বলাবলি করে, রাস্তার লোক, পাশের বাড়ি, রেডিও—ছেলেদের এসব একেবারে মুখস্থ!

হীরেনদা হঠাৎ সীরিয়াস হয়ে গিয়ে বললেন, একটা কথা ভেবে দেখেছিস? আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে, আমার এই ছেলের বাল্যস্মৃতি কী হবে? আমরা আমাদের ছেলেবেলার কত মধুর স্মৃতি নিয়ে এখনো জল্পনাকল্পনা করি। আমি পাড়াগাঁয়ে মানুষ—সেসব কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু এই কলকাতার ব্যাপারেও, দু-একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা, রথের মেলা, পরেশনাথের মিছিল দেখতে যাওয়া—এইসব টুকরো-টুকরোভাবে মনে পড়ে। আর ওরা কী মনে করবে? গোলাগুলি, বোমা, খুন—এই বাল্যস্মৃতি!

আমি বললাম, আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে তো দেশের অবস্থা এরকম থাকবে না। গোলাগুলি, পথেঘাটে মারামারি তখন ইতিহাস শুধু—তখন ওরা ভাববে, আমাদের ছেলেবেলায় লোকগুলি কী বোকা ছিল, সত্যিকারের কোন কাজ না-করে শুধু নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে—

হীরেনদা তিক্তহাস্যে বললেন, তোর কী ধারণা, আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে দেশের অবস্থা বদলে যাবে? বদলে ভালোর দিকে যাবে?

—নিশ্চয়ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তখন সমাজে এরকম শোষণ থাকবে না, প্রত্যেকের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে—কেউ কারুর ওপরে জোর করে মতামত চাপাবে না—

—তুই খুব আশাবাদী দেখছি!

আমি লঘুভাবে হাসতে-হাসতে বললাম, হ্যাঁ হীরেনদা, আমি একটা যাচ্ছেতাই-রকমের আশাবাদী। চিকিৎসার অতীত আশাবাদীও বলতে পারেন। নইলে এখন আর বেঁচে থাকার পয়েন্ট কী?

১৯

আমাদের ছেলেবেলায় কত ভালো-ভালো ভূত ছিল এই কলকাতা শহরে! সেইসব ভূতেরা এখন কোথায় গেল?

কলকাতায় এখন একটাও 'ভূতুড়ে বাড়ি' নেই, কোথাও কারুকে 'ভূতে ধরে' না; এমনকী মায়েরাও আজকাল ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমির সময় ভূতের ভয় দেখান না। ওতে নাকি ছোটছেলে-মেয়েদের মনে কুসংস্কার দানা বেঁধে যায়।

আমাদের তো গোটা বাল্য ও কৈশোরই কেটেছে ভূতের ভয়ে। ছুটির দিনে দুপুরবেলা ছাদে ওঠার উপায় ছিল না, কেননা, 'ঠিক দুপুর বেলা ভূতে মারে ঠেলা!' আর রাত্তিরে? উঃ, ভাবলে এখনো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়!

উত্তর কলকাতায় আগে প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার রাত্রে হীরামতী রাক্ষসী বেরুত। হীরামতী রাক্ষুসী দেড়তলার সমান উঁচু, মূলোর মতো দাঁত, তার হাত পৌঁছোত তিনতলা পর্যন্ত। কালো লোহার মতন দেহ, হাঁটার সময় ঝনঝন শব্দ, আর বিকট গলায় চেঁচিয়ে বলত, 'হীরামতী রাক্ষসী, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি! যে-ছেলেটা বদমাইসি করে, তাকে ধরে খাই!' আর তিনতলার বারান্দা থেকে মা আমাকে বলতেন, আর কোনদিন কাচের গেলাস ভাঙবি? আর কক্ষনো জিজ্ঞেস না-করে আলমারি খুলবি? ধরিয়ে দিচ্ছি! হীরামতী একে নিয়ে যাও তো? হীরামতী সড়াক করে তার হাতটা বাড়িয়ে দিত বারান্দার দিকে, আমার তখন এমন গলা শুকিয়ে গেছে যে কাঁদতেও পারছি না—শক্ত করে চেপে আছি মায়ের আঁচল! তারপর মা যখন বললেন, থাক, এবারকার মতন ছেড়ে দাও—তখনও হীরামতী হাত সরায় না। মা তখন একটা দোআনি এনে তার হাতে দিয়ে বলতেন, নাও, খেয়ে নাও এটা। হীরামতী টক করে খেয়ে ফেলত পয়সাটা!

সেই ছেলেবেলায় মনে হতো, মা-বাবারা কী ভীষণ বীর, অতবড় রাক্ষসীর সামনেও তাঁরা কী রকম অনায়াসে হাসতে পারেন!

একটু বড় হয়ে শুনেছিলাম, হীরামতী আসলে একজন পানওয়ালা। শ্যামবাজারে তার পানের দোকান। প্রতি শনি আর মঙ্গলবার ঐ টিনের পোশাক পরে বেরিয়ে ঘুরত। ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা থাকত তার ভয়ে। হীরামতীর শেষ অবস্থাটা খুব করুণ। খেলা দেখিয়ে, বেশ কিছু পয়সা উপার্জন করে সে ফিরত অনেক রাত্রে। এক রাত্রে একজন গুণ্ডা তাকে মেরে পয়সাকড়ি কেড়ে নেয়, মারের চোটে একটা পা ভেঙে গিয়েছিল তার, তাই আর রাক্ষুসী সাজতে পারেনি। কলকাতার গুণ্ডারা ভূতের চেয়েও শক্তিশালী।

এখনো আমার মন কেমন করে হীরামতী রাক্ষসীর জন্য।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা তিনতলা বাড়ি সারা বছর খালি পড়ে থাকত। সবাই বলত ওটা ভূতের বাড়ি। বাড়িটা ভাঙাচোরা কিছুই না—বেশ মজবুত ধরনের, এখন ওধরনের কোন বাড়ি খালি পড়ে থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যেত ঐ

বাড়িটা—আমরা শুনতাম যে সন্ধের দিকে ঐ বাড়ির জানালায় ভূতের বাচ্চাদের দেখা যায়। বাচ্চা ভূত কখনো দেখিনি—বড় ভূতও দেখিনি অবশ্য, কিন্তু বড় ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না—বাচ্চা ভূতই একটু দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র সুকুমার রায়ের কবিতায় কিছু বাচ্চা ভূতের কথা পড়েছি, সেই যে, 'পাস্তভূতের জ্যান্ত ছানা দেখুন বিনা চশমাতে'। আমরা সন্ধেবেলা সেই বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম একদৃষ্টিতে। অনেক দিন আগেকার কথা, তবু যেন এখনো অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে—কোন-কোন সন্ধেবেলা ঐ বাড়ির জানলায় ছায়া-ছায়া ভূতের বাচ্চাদের দেখতে পেতাম—আর সঙ্গে-সঙ্গে, ওরে বাবারে বলে চিৎকার করে ছুটে পালাতাম।

আমাদের স্কুলের এক মাস্টারমশাই ছিলেন হরিনাথ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী তাঁর নিজস্ব পদবী ছিল, না লোকে এই উপাধি দিয়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। খুব লম্বা চওড়া মানুষ, মাথায় বিরাট জটা, গলার আওয়াজটা গমগমে বাজের মতন। তিনি থাকতেন কলুটোলার এক মেসে। আমাদের পাড়ার ঐ ভূতুড়ে বাড়ির কথা শুনে তিনি বললেন, বাঃ বেশ তো, আমি থাকব ঐখানে—আমার সাধনভজনের জন্য একটা নির্জন জায়গা দরকার!

সবাই বারণ করল, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই। একদিন তিনি কম্বল বালিশ নিয়ে উঠলেন গিয়ে সেখানে। ঠিক হলো, তিনি প্রত্যেক দিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে এসে খাবেন। তিন-চারদিন কেটে গেল, কিছুই হলো না! রাত দশটা আন্দাজ তিনি খেতে আসতেন—তখন ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসত—তবু জেগে থাকতাম দারুণ কৌতূহল নিয়ে। ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সহজে কথাই বলতে চান না। বাবা যখন জিজ্ঞেস করতেন, দু-এককথায় উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, ভূতের দেখা পেলে ভালোই হতো হে! মানুষের সঙ্গ আর ভালো লাগে না—ভূতের সঙ্গেই আলাপ জমাতাম! কিন্তু ভূতেরা আমাকে বোধ হয় ভয় পায়—আমার সামনে আসে না। তবে শব্দটব্দ করে বটে।

একদিন রাত আটটা আন্দাজ পাড়ার তিন-চারটে ছেলে ছুটতে-ছুটতে এসে আমাদের বাড়িতে খবর দিল, শিগগির আসুন! শিগগির! আপনাদের সেই ভদ্রলোকের কী যেন হয়েছে, দারুণ চ্যাচাচ্ছেন!

বাবা-কাকারা বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি—আমাদেরও খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বড়রা দারুণ হিংসুটে হয়, ভালো-ভালো জায়গায় কখনো বাচ্চাদের নিয়ে যায় না। বাবা-কাকারা অবশ্য সরাসরি নিজেরাও সেই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেলেন না—মোড় থেকে একজন পুলিসকে ডেকে নিলেন। ভূতেরা যে কেন

পুলিসকে ভয় করবে—এটা অবশ্য আমি আজও বুঝতে পারি না।

খানিকক্ষণ বাদে ব্রহ্মচারী মশাইকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো। তাঁর ডানপায়ের বুড়ো আঙুল থেকে খুব রক্ত বেরুচ্ছে, শরীরে আর কোন ক্ষত নেই। তিনি অনবরত চ্যাঁচাচ্ছেন, ওঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

রোমহর্ষক ব্যাপার! ভূতে এসে মাস্টারমশাইয়ের পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছিল।—মাস্টারমশাই তখন চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন, ভূতকে দেখতে পাননি—ভূত নিশ্চয়ই মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে এসেছে, নইলে পায়ের আঙুল কামড়াবে কী করে!

কত লোক যে এসে ভিড় করল আমাদের বাড়িতে! ভূতে মানুষ ধরার এমন একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত! সে-রাত্রে আমাদের চোখ থেকে ঘুম উপে গেল, কেউ আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য তাড়াও দিল না—কত যে ভূতের গল্প শুনলাম। প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন আত্মীয় বা বন্ধু কখনো-না-কখনো ভূতের পাল্লায় পড়েছে। তবে এ পর্যন্ত কোনদিন কোন ভূতকে কারুর পায়ের আঙুল কামড়াতে শোনা যায়নি—এটা একটা সত্যিই নতুন ব্যাপার।

কেউ-কেউ অবশ্য আড়ালে সন্দেহ প্রকাশ করল যে ভূত নয়, ও বাড়িতে অনেক ধেড়ে-ধেড়ে ইঁদুর—সেই ইঁদুরেই কামড়েছে। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে এই সন্দেহ উড়ে গেল হাওয়ায়।

ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই টানা এক মাস ছুটি নিলেন স্কুল থেকে। তাঁর পায়ের অনেক চিকিৎসা করানো হলো, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর পা আর সারল না। বুড়ো আঙুলটা বিরাট হয়ে ফুলে উঠল—শেষ পর্যন্ত সেই আঙুলটা কেটে বাদ দিতে হলো। ইঁদুরে কামড়ানোর কথা আর ভুলেও কেউ উচ্চারণ করল না, সবাই বলল, ভূতের দাঁতের বিষ, ও কী আর ডাক্তারের ওষুধে সারে! ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই ক্লাসে আমাদের দারুণ জোরে কান মলে দিতেন—সুতরাং তাঁর একটা আঙুল কাটা যাওয়ায় আমরা কেউ তেমন দুঃখিত হইনি।

আমাদের ছেলেবেলায় আরো অনেক ভালো-ভালো ভূত ছিল। এখন কলকাতা শহরটা একেবারেই রহস্য-রোমাঞ্চহীন। সেইসব ভালো-ভালো ভূতেদের জন্য আমার এখন মাঝে-মাঝে মন খারাপ লাগে। এখনকার ছোটরা কী এমন দোষ করেছে যে, তাদের দেখতে পাবে না কিংবা তাদের গল্প শুনবে না!

২০

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা। সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাহে লেখা, ঐ যায় যে দেখা!

ঠিক সেইরকমই, শুক বলল, আরে যাও যাও! তোমাদের সাউথ ক্যালকাটায় আবার লাইফ আছে নাকি? সবাই মেপে-মেপে কথা বলে, মেপে-মেপে হাসে! প্রাণ খুলে কেউ বাঁচতে জানে ওখানে?

সারী বলল, আহা-হা-হা! তোমাদের নর্থ ক্যালকাটায় একেবারে লাইফের ছড়াছড়ি! এত বেশি লাইফ যে লোকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না। ঘিঞ্জি-ঘিঞ্জি সব গলি, গায়ে-গায়ে লাগানো বাড়ি, রাস্তায় যা ভিড় লোকের গায়ে ধাক্কা লাগবেই। আমি একদিন গিয়েছিলাম, কী যেন জায়গাটার নাম, হাতিবাগান—ওরে বাসরে, কী ভিড়!

—নর্থ ক্যালকাটাকে ভালোবাসে বলেই তো এত লোক এখানে থাকতে চায়!

—ভালোবাসে না ছাই! ভালোবাসলে কেউ রাস্তাঘাট ওরকম নোংরা করে রাখে? আমাদের ওদিকটা কত ফাঁকা-ফাঁকা, কত পরিষ্কার।

—মরুভূমি তো আরো ফাঁকা। আরো পরিষ্কার। তাহলে মরুভূমিতে থাকলেই হয়! সাউথ ক্যালকাটায় আমি তো কোনদিন থাকব না! ন্যাকা-ন্যাকা কথা, ছেলেগুলো মেয়েদের মতন, আর মেয়েরা—

সারী এবার চোখ পাকিয়ে বলল, এই, আমি বুঝি ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলি? বেশ ঠিক আছে—

শুক খপ করে সারীর হাতটা চেপে ধরে বলল, তুমি অমনি রাগ করছ কেন? তোমার কথা কী বলেছি? দু-একজন এক্সসেপশান থাকেই। তাছাড়া, এমনি তর্ক হচ্ছে, এর মধ্যে পার্সোনাল ব্যাপার টেনে আনছ কেন?

সারী আবার বসে পড়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। শুক সিগারেট ধরিয়েছে।

সারী বলল, সাধারণ ভদ্র ব্যবহারকে তোমরা বলো ন্যাকা-ন্যাকা কথা! তোমাদের তো সব কাঠখোট্টা ব্যাপার! বাড়িতে বসেও এমন চেঁচামেচি করে কথা বলবে যে পাশের বাড়ির লোকের কান ঝালাপালা, তোমাদের সেটাও খেয়াল থাকে না।

—তোমাদের সাউথের লোকেরা ভদ্রতার কী জানে? সাহেবি আদবকায়দার নকল আর কথায়-কথায় ইংরিজি! তাও, ইংরিজি বলার সময় এমন ঠোঁট বেঁকানো আর ভুরু কুঁচকোনো—যেন সবাই এক-একটি সাহেবের পোষ্যপুত্তুর!

—নর্থেও অনেক লোক ইংরিজি বলে, কিন্তু ভুল বলে, বিচ্ছিরিভাবে বলে!

বউয়ের অসুখ না-বলে, তোমরা বলো ওয়াইফের অসুখ! জরুরি কাজ আছে না-বলে বলো আর্জেন্ট কাজ আছে! শুনলেই হাসি পায়! আপ টু এগারোটা পর্যন্ত কিংবা শতকরা টেন পারসেন্ট—এধরনের কথাও নর্থেই শুধু শোনা যায়! কথায়-কথায় ইংরিজি বলাটা ঠিক না-হতে পারে। কিন্তু ইংরিজি বলতে গেলে সাহেবদের মতন বলাই ভালো।

—সাউথে বুঝি সবাই সাহেবদের মতন ইংরিজি বলে? আমার আর জানতে বাকি নেই! ওপর-ওপর ফরফর করে শুধু, ভেতরে ঢন-ঢন! সবাই তো আপস্টার্ট—সত্যিকারের কিছু কালচার আছে ওখানে? কটা বনেদী বাড়ি আছে সাউথে? নর্থে দ্যাখো গিয়ে বনেদী বাড়ির ছড়াছড়ি। সত্যিকারের কালচার, কিংবা ভারতীয় ভদ্রতা তো এরাই বাংলাদেশে...

—তোমাদের ঐসব বনেদী বাড়ি নিয়ে ধুয়ে জল খাও এখনো! ঐসব বনেদী বাড়ির অনেকের স্ক্যাণ্ডালও জানতে বাকি নেই। সত্যিকারের ভদ্র কিংবা কালচার্ড হবার জন্য বনেদী হবার দরকার হয় না, বড়লোক হবারও দরকার হয় না।

—ক'টা স্কুল-কলেজ আছে তোমাদের সাউথে? বড়বড় সব কলেজই তো নর্থে—

—এক-একটা হরি ঘোষের গোয়াল। লেখাপড়া কিচ্ছু হয় না!

—আমাদের এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি একসময় পুরো নর্থ ইণ্ডিয়ায়—এমনকী বার্মাতেও—

—এখন নাম শুনলেই লোকে নাক সিটকোয়—

—তবু তো একটা ঐতিহ্য আছে। তোমাদের কী আছে কী?

—আমাদের ওখানে মানুষজন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে জানে। বেঁচে থাকা মানে তো আর পরনিন্দা আর ঝগড়াঝাঁটি নয়—

—ছাই জানে! আমাদের এখানে কেউ কারুর নিন্দে করতে গেলে সোজাসুজি করে, মুখের ওপর যা বলার বলে দেয়। আর তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, মিছরির ছুরির মতন—

—ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বললেও তাতে ভদ্রতা বজায় থাকে—বুদ্ধিমান লোকরাই এরকমভাবে বলতে পারে। বোকা লোকরাই চ্যাচামেচি করে শুধু—

—সরল লোকদেরই তোমরা আজকাল বোকা বলো!

—আহা, কত সরল, তা আমার খুব জানা আছে!

শুক সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে নতুন করে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হল। সারী চায়ের কাপে দিল শেষ চুমুক।

শুক আবার বলল, এটা তো মানবে, থিয়েটারই হলো একটা জাতির

কালচারের আয়না! ক'টা থিয়েটার হল আছে সাউথে? সবেধন নীলমণি তো ঐ এক বারোয়ারি মুক্তাঙ্গন। আমাদের এখানে মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, স্টার, রঙমহল, কাশী বিশ্বনাথ—

—আঃ, কী সুন্দর কালচারই না ফুটে বেরোয় ওখানকার নাটকগুলোয়! একবার দেখতে গিয়েছিলাম, বমি আসে! শুধু সংখ্যায় বেশি থাকলেই হয় না। তাহলে বলো না, হাসপাতালও নর্থে বেশি আছে অনেক। থাকবেই তো! বাড়িগুলো যে এক-একটা রোগের ডিপো। যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমন নোংরা—হবেই তো, এত ঘিঞ্জি হলে—

—তোমার শুধু ঐ এক যুক্তি আছে, ঘিঞ্জি আর নোংরা। এটা বুঝতে পারছ না—নর্থটা হচ্ছে পুরোনো পাড়া। কলকাতার আদি জায়গা। পুরোনো জায়গা একটু ঘিঞ্জি হয়ই। তোমাদের বালিগঞ্জ-ফালিগঞ্জ তো সেদিনের ছেলে। ষাট-সত্তর বছর আগেও বনজঙ্গল ছিল।

—নর্থটা পুরোনো বলছ, ঠিকই, কিন্তু কত পুরোনো? বড়জোর এখানকার চেয়ে একশো-দেড়শো বছর? তার আগে শ্যামবাজার-বাগবাজারও বনজঙ্গল ছিল। কিন্তু তোমাদের ট্র্যাজেডি হচ্ছে, তোমরা সেই পুরোনোটাই আঁকড়ে ধরে বসে আছো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক হতে পারোনি!

—তোমাদের সাউথের মতন আধুনিক হতেও চাই না। আধুনিক হওয়া মানেই চোঙ্গা প্যান্ট, বড় জুলফি, ফাঁপিয়ে চুল আচড়ানো আর চাল মেরে কথা বলা! এদিকে এক ফোঁটা মুরোদ নেই। রাস্তা জুড়ে যদি একটা ষাঁড় বসে থাকে, সেটাকে সরিয়ে দিতে পারে না—সেটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই ষাড়, সরে যাও বলছি, নইলে তোমাকে ফুল দিয়ে মারব!

সারী খিলখিল করে হাসল। হাসি তার থামতেই চায় না। তারপর বলল, উঃ, কী বস্তাপচা গল্প! এ গল্পটা যে বানিয়েছে, তার একটু কল্পনাশক্তি পর্যন্ত নেই! ওখানে তোমাদের মতন ষাড় ঘুরে বেড়ায় না রাস্তায়-ঘাটে! মুরোদ আছে কিনা একদিন পরীক্ষা করে দেখবে? শান্তনুদার সঙ্গে একদিন পাঞ্জা লড়ে দেখো না!

—শান্তনুদাটা আবার কে?

—সে যে-ই হোক না!

—তবু শুনি, শুনি! শান্তনুদার কথা তো আগে শুনিনি। খুব হিরো বুঝি?

—ও কথা থাক! সাউথের ছেলেদের কথা বললে, আর নর্থের ছেলেরা কীরকম? চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, চুলে একগাদা তেল দেয়, আর কথা বলে স-স করে...সামবাজারের সসীবাবু সসা কিনতে মেয়েদের দিকে এমন অসভ্যের মতন তাকায়!

—এটা বুঝি আমার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে?

সারী আবার হাসতে-হাসতে বলল, এবার তুমি পার্সোনালভাবে নিচ্ছো কেন? সব ব্যাপারেই ব্যতিক্রম থাকে। নর্থের মেয়েরাও সাজগোজ করে গাঁইয়ার মতন—খুব দামি শাড়ি কিংবা একগাদা গয়না পরে রাস্তায় বেরোয়—অথচ সবরকম

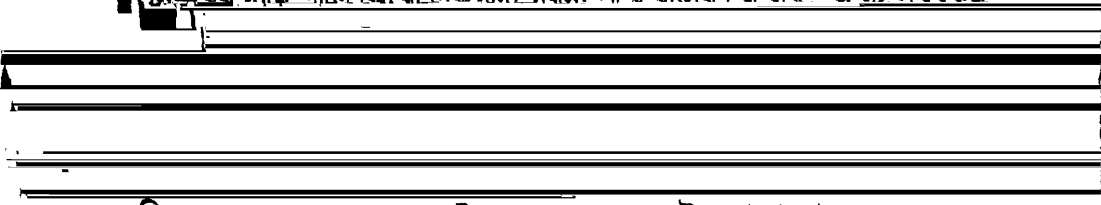

শাড়ি, সবরকম গয়না যে সবাইকে মানায় না—সেটা বোঝে না!

—তোমাদের সাউথে মেয়েদের আবার সাজগোজই আছে শুধু, রূপ আছে ক'জনের? আমাদের এখানকার অনেক বনেদী বাড়িতে এমন সব সুন্দরী মেয়ে এখনো আছে, দেখলে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।

—দু-চারজনের কথা হচ্ছে না। সব মিলিয়ে রাস্তাঘাটে যা দেখা যায়—

এ তর্কের কোথায় শেষ হবে? সারী বলল, আচ্ছা বাবা, অত কথায় দরকার নেই। আমাদের রাসবিহারী এভিনিউ হচ্ছে রাই, তোমাদের শ্যামবাজারটা শ্যাম।

এর পরের গান, রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের!
